ALWAYS EXCLUSIVE
Vandana® SAREES
Cotton Printed Sarees
Contact - 22188744/1386

দাম : ৪.০০ টাকা

স্বস্তিকা

৬৩ বর্ষ ১৬ সংখ্যা ।। ১৮ পৌষ, ১৪১৭ সোমবার (যুগাব্দ - ৫১১২) ৩ জানুয়ারি ২০১১ ।। Website : www.eswastika.com

আসবাব
বর্ধমান
(০৩৪২) ২৫৬৫৯৩১

চার্জ না থাকার সংবাদে ইন্দ্রেশকুমারকে আলিঙ্গন আত্মজনের।

চার্জশীটে শুধুই নাম, ইন্দ্রেশকুমারের বিরুদ্ধে কোনও চার্জই নেই

নিজস্ব প্রতিনিধি।। শেষ পর্যন্ত সিবিআই গত ২৩ ডিসেম্বর রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের কেন্দ্রীয় কার্যকারিণী সদস্য ইন্দ্রেশকুমারকে জিজ্ঞাসাবাদ করল। যদিও পরদিন প্রায় সব সর্বভারতীয় দৈনিক সংবাদপত্রের বিবরণে প্রকাশ, ইন্দ্রেশকুমারের নাম রাজস্থান এ টি এস প্রদত্ত চার্জশীটে কেবলমাত্র উল্লেখিত হয়েছে যদিও তার বিরুদ্ধে কোনও চার্জই নেই। ফলে যা হবার হয়েছে— লাগাতার কয়েক ঘণ্টা জিজ্ঞাসাবাদে এমন কোনও তথ্যই উঠে আসেনি যার ফলে ইন্দ্রেশজীকে অভিযুক্ত করা যায়। ইন্দ্রেশজী রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের শীর্ষ নেতৃত্বের সরকারকে দেওয়া কথার কোনওরকম অন্যথা করেননি। উল্লেখ্য, সঙ্ঘের সরকার্যবাহ ভাইয়াজী (সুরেশ) যোশী সরকারকে এক বিবৃতির মাধ্যমে জানিয়েছিলেন, 'নিরপেক্ষ তদন্তের স্বার্থে সঙ্ঘের পক্ষ থেকে সবরকম সহযোগিতা করা হবে।'

(এরপর ৪ পাতায়)

অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতেই মমতাকে তোয়াজ কংগ্রেসের

গুপ্তপুরুষ।। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর লেখা চিঠি নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি সরগরম। সিপিএম বলছে মমতাকে খুশি করতেই সোনিয়া গান্ধীর নির্দেশে চিদাম্বরম জঙ্গলমহলে হার্মাদ শিবিরের অস্তিত্ব নিয়ে রাজ্য সরকারকে অভিযুক্ত করেছেন। এই অভিযোগ একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। বিহারে নির্বাচনী বিপর্যয়ের পর কংগ্রেসের কে-কংগ্রেস জোটের পরাজয় নিশ্চিত। কেরল, উত্তরপ্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ, অসম কোথাও কংগ্রেস প্রধান রাজনৈতিক শক্তি নয়। নির্বাচনে জোট ভিন্ন দ্বিতীয় অন্য কোনও পথ কংগ্রেসের সামনে খোলা নেই। পশ্চিমবঙ্গে বাম বিরোধী প্রধান রাজনৈতিক দল তৃণমূল কংগ্রেস। তাই জোট রক্ষা করতে মমতার মানভঞ্জন না করে কংগ্রেস

চিদাম্বরমের চিঠি

In an apparent effort to regain lost ground, a sizeable number of armed cadres were recruited, trained and deployed in West Midnapore district. There is evidence to show that Harmad camps are mostly located in CPI (M) party offices and houses of local CPI (M) cadres. It is a matter of grave concern that these cadres have been provided with fire arms.

Besides, in the run up to the elections, there has been a perceptible increase in clashes between supporters of the CPI (M) and the TMC. According to our figures, up to December 15, 2010, TMC cadres who have been killed and injured number 96 and 1237 respectively. Likewise, CPI (M) cadres who have been killed and injured number 65 and 773 respectively and Congress cadres who have been killed and injured number 15 and 221 respectively. These numbers present an alarming picture and point to a virtual collapse of law and order in parts of West Bengal.

এখন পা রাখার মাটি নেই। নতুন বছরে আরও ছয়টি রাজ্যে বিধানসভার নির্বাচন। এই ছয়টি রাজ্য— তামিলনাড়ু, পন্ডিচেরি, কেরল, উত্তরপ্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ এবং অসমে কংগ্রেসের রাজনৈতিক শক্তি এতটাই খারাপ যে জোট ছাড়া এককভাবে ক্ষমতায় জেতা অসম্ভব। ভারতে বৃহত্তম আর্থিক দুর্নীতি স্পেকট্রাম কেলেঙ্কারিতে তামিলনাড়ুতে ক্ষমতাশীল দল ডি এম কে সরাসরিভাবে জড়িত। এই ডি এম কে-র সঙ্গে কংগ্রেসের জোট আছে। এখন যা পরিস্থিতি তাতে বোঝাই যাচ্ছে যে আসন্ন বিধানসভার নির্বাচনে তামিলনাড়ুতে ডি এম নেতৃত্বের দ্বিতীয় উপায় আর নেই। বিশেষত যখন মমতা জঙ্গলমহলে ইস্যুতে কংগ্রেসের সঙ্গে তাঁর দলের জোট একপ্রকার ভেঙে দিতে চলেছেন। যৌথবাহিনীর আড়ালে জঙ্গলমহলে সিপিএম দলীয় হার্মাদদের অস্ত্র হাতে নামিয়ে গ্রাম দখল করছে এই তথ্য কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের কাছে গত জুলাই মাস থেকেই ছিল। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দাদের এই তথ্যের ভিত্তিতেই চারমাস আগে মমতা প্রধানমন্ত্রী এবং কংগ্রেস নেত্রী সোনিয়া গান্ধীকে স্মারকলিপি দিয়েছিলেন। কিন্তু মমতার স্মারকলিপিকে কংগ্রেস নেতৃত্ব তখন পাত্তা

(এরপর ৪ পাতায়)

চীনা পণ্যের মজুত রুখতে অ্যান্টি ড্যাম্পিং শুল্ক

নিজস্ব প্রতিনিধি।। সস্তার চীনা ও ইজরায়েলী পণ্যের ওপর 'অ্যান্টি-ডাম্পিং' ট্যাক্স বসাতে চলেছে ভারত। তথ্য-প্রযুক্তি সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি আমদানির ক্ষেত্রে সর্বাধিক ২৬৬ শতাংশ 'অ্যান্টি-ডাম্পিং' শুল্ক লাগু করতে চলেছে সরকার। প্রসঙ্গত, ভারতের বাজার ধরার স্বার্থে চীনা কোম্পানীগুলি তাদের উৎপাদিত পণ্য খুব কম দামে এমনকী অনেক সময় ব্যবসায়িক স্বার্থে উৎপাদন মূল্যের তুলনায় কিছু কম দামেই এদেশের বাজারে ছড়িয়ে দেয়। অনেক ব্যবসায়ী তাদের লাভের অঙ্ক বাড়ানোর স্বার্থে ওইসব সস্তার চীনাপণ্য মজুত করে রাখে। সেই মজুতদারী রুখতেই মজুতদারী বিরোধী (অ্যান্টি-ডাম্পিং) শুল্ক বসাতে চলেছে ভারত সরকার। সরকারের কাছে বরাবরই অভিযোগ ছিল কমদামী চীনা পণ্যগুলি ভারতের বাজারে আসায় সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এদেশের কুটীর শিল্প। কিন্তু বামদলগুলির বাধায় এনিয়ে এতদিন কোনও কার্যকরী ভূমিকা নিতে পারেনি সরকার। তথ্য-প্রযুক্তির পাশাপাশি টেলিকম ক্ষেত্রেও চীনা পণ্যের ওপর 'অ্যান্টি-ডাম্পিং' শুল্ক বসাতে চলেছে কেন্দ্র। সঙ্গতভাবেই প্রশ্ন উঠছে, ১ লক্ষ ৭৬ হাজার কোটি টাকার

(এরপর ৪ পাতায়)

পাকিস্তানে হিন্দু নির্যাতন চলছেই

নিজস্ব প্রতিনিধি।। পাকিস্তানে হিন্দুদের ওপর এখনও যে নির্যাতন অব্যাহত তা খোদ পাকিস্তানের সরকারি সূত্রেই জানা গেছে। পাকিস্তানের বালুচিস্তান প্রদেশের হিন্দুরা ভারতে রাজনৈতিক আশ্রয় লাভের জন্য ইসলামাবাদস্থিত ভারতীয় হাইকমিশনের কাছে আবেদন জানিয়েছে। পাকিস্তানের মানবাধিকার মন্ত্রকের আঞ্চলিক ডাইরেক্টর সৈয়দ আহমেদ খান এই তথ্য জানিয়েছেন। তিনি আরও জানিয়েছেন যে কমপক্ষে ২৭টি হিন্দু পরিবার এই আবেদন করেছে। তাঁর বক্তব্য, বেশ কয়েক শতাব্দী ধরেই হিন্দুরা বালুচিস্তানে বসবাস করে আসছে। কিন্তু সম্প্রতি তাঁদের মধ্যে অনেকেই এখন ভারতে চলে যেতে চাইছেন। কেননা তাদের পরিবারের কয়েকজন ইতিমধ্যে অপহৃত হয়েছেন যাদের কোনও সন্ধান এখনও পর্যন্ত পাওয়া যায়নি।

বালুচিস্তানের ডি আই জি হামিদ শেখ বলেছেন, এই প্রদেশে প্রায় ৭৮টি দল রয়েছে যারা এই অপহরণ কাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত। তারাই হিন্দুদের অপহরণ ও হত্যার সঙ্গে জড়িত। উল্লেখ্য, বালুচিস্তানে এখন প্রায় ২৫ লক্ষ হিন্দু বসবাস করছেন।

২০২০ সালের মধ্যেই বৈভবসম্পন্ন স্বাভিমানী ভারত : স্বামী রামদেব

আর্য সমাজের অনুষ্ঠানে রামদেবজী ও অন্যান্যরা।

বাসুদেব পাল।। ভ্রষ্টাচার-মুক্ত, ঐশ্বর্যযুক্ত, স্বাভিমানী ভারত নির্মাণের আহ্বান জানালেন যোগগুরু বাবা রামদেবজী। গত ২৬ ডিসেম্বর কলকাতায় মহাজাতি সদন সভাগারে 'আর্য সমাজ, কলকাতা' শাখার ১২৫ তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে আয়োজিত আটদিনব্যাপী উৎসবের প্রদীপ প্রজ্বলন করে তিনি উদ্বোধন করেন। তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন স্বামী দিব্যানন্দ, অম্বেলাল শেঠ, রবি পোদ্দার, শ্রীরাম আর্য, দীপক আর্যসহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

রামদেবজী তাঁর ভাষণে বলেন, বৈভবময় অতীত ভারতের জন্য গৌরব, বর্তমানের জন্য পীড়া এবং স্বর্ণিম ভবিষ্যৎ গঠনের জন্য সংকল্প করতে হবে এবং সেজন্য কাজ করে যেতে হবে। শিশু-বালকদের সংস্কার প্রদান করতে হবে। আমরা পৃথিবীর প্রাচীনতম উন্নত সভ্যতা ও সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী। আমেরিকার সভ্যতা মাত্র ৫০০ বছরের, আর ইউরোপের যা কিছু তা মাত্র ২০০০ বছরের, সৌদি আরব ১৪০০ বছরের। আমাদের বৈদিক সভ্যতা ও সংস্কৃতি লক্ষ কোটি বছরের প্রাচীন এবং নিরবচ্ছিন্নভাবে আজও বহমান। ভারতই পৃথিবীকে দিয়েছে—ভাষা, শিক্ষা,

(এরপর ৪ পাতায়)

রাজনৈতিক কাপালিকদের কবলে পশ্চিমবঙ্গ

নিশাকর সোম

রাজ্যে রাজনীতির বলি হলো ছাত্র। আশুতোষ কলেজে ছাত্রের চোখ নষ্ট, আন্দুলে ছাত্রের মৃত্যু। এসব ঘটনার আগে কলেজে কলেজে ছাত্র-সংঘর্ষ হচ্ছিল। ঠিক যখন সিপিএম-এর ঘোষণা "ছাত্ররা মমতার বাড়ি ঘেরাও করবে।" ঠিক এর পরেই ছাত্র-সংঘর্ষ মৃত্যুর সংঘর্ষে পরিণত হলো। স্মরণ করা দরকার, ঠিক এরই আগে মমতা বলেছিলেন— "হামসে যো টকরাগেগা— চুরচুর হো যায়েগা"। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন —"আমাদের এগোতে না দিলে ভেঙে দোব।" তৃণমূল সাংসদ শুভেন্দু অধিকারী কংগ্রেসকেও রোজ হুমকি দিচ্ছেন— কথাগুলির উদ্ধৃতি দিচ্ছি না।

ছাত্র আন্দোলনে এখন এ-অবস্থা কেন? দেশের স্বাধীনতা-আন্দোলনে ছাত্রদের গৌরবময় ভূমিকা উজ্জ্বলতা সৃষ্টি করেছিল। বন্দী আজাদ-হিন্দ সৈনিকদের মুক্তির দাবিতে কলকাতার ধর্মতলায় ছাত্র-জমায়েত হলো— পুলিশের গুলিতে রামেশ্বর ব্যানার্জি-আবদুল সালাম নিহত হন। ছাত্ররা ধর্মতলায় অবস্থান করতে থাকেন। ছাত্রদের সামনে ইংরেজ টমিরা মেশিনগান ফিট করে সামনে ছিল। ছাত্রদের এই অবস্থানে কোনও কংগ্রেস-নেতা আসেননি। এসেছিলেন ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি। তিনি শীতের মধ্যে সারারাত সেখানে থেকে অসুস্থ হয়েছিলেন। তখন ছাত্রদের সামনে একটা আদর্শ ছিল— স্বাধীনতার লড়াই। আর এখন ছাত্রদের সামনে ক্ষমতা দখলের লড়াই। ক্ষমতা চাই। ছাত্র-সংগঠনগুলিকে রাজনৈতিক দলের ডিপার্টমেন্টে পরিণত করা হয়েছে। রাজনৈতিক দলের পরিচালনায় কর্মসূচী ঠিক হয়। বস্তুত ছাত্রসংগঠন স্বীয় দলের রবার স্ট্যাম্প-এ পরিণত হয়েছে।

> **ছাত্র ইউনিয়নের নেতারা যে সবাই ধোয়া তুলসীপাতা হয় না তার নজির আছে। অতীতে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবার্ষিকী কমিটির কিছু 'কেচ্ছা' তখন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল। সে সময়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-এর নেতৃত্বে যাঁরা ছিলেন তাঁদের মধ্যে একজন তো বর্তমানে বড়বড় কথা বলে থাকেন। এমনকী মধ্য কলকাতার দুটি কলেজে চীপ স্টোর-চীপ ক্যান্টিন-এর দুর্নীতির কথাও জানা যায়। সেইসব দুর্নীতিগ্রস্ত নেতারা কমিউনিস্ট পার্টিতে তথা সিপিএম-এ বিরাজ করেছিল এবং বোধহয় এখনও করে থাকে। শুধু ছাত্র ইউনিয়ন নয়, শ্রমিক ইউনিয়নের 'বামপন্থী' নেতাদের দুর্নীতির কথা এখনও প্রকাশ পাচ্ছে।**

প্রশ্ন উঠেছে ছাত্র ইউনিয়ন দখলে ছাত্র-সংগঠনগুলি কি ছাত্রদের পঠন-পাঠন-এর উন্নতি তথা ছাত্র-ছাত্রীদের কল্যাণের জন্য করে থাকে। না— ছাত্র-ইউনিয়নগুলি দখল করার পিছনে দুটি স্বার্থ কাজ করে। প্রথমতঃ রাজনৈতিক কারণ— পার্টির বা দলের ক্যাডার সৃষ্টি করা, আরও পার্টিতে রিক্রুট করা। দ্বিতীয় কারণটা আরও আকর্ষণীয়। তা'হলো আজকের ছাত্র ইউনিয়নগুলির হাতে লক্ষ লক্ষ টাকার তহবিল আসে। এই টাকা দু'ভাবে আসে— (১) ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির সময়ে কলেজের ফি' এর সঙ্গে ইউনিয়ন ফি'-এর চাঁদা, ডোনেশন কেটে নেওয়া হয়। (২) ছাত্র-ইউনিয়ন দখলে থাকলে ছাত্র-ভর্তিতে আধিপত্য বিস্তার করা যায় এবং তার ফলে ভর্তির ব্যবস্থা করার জন্য ছাত্র-সংগঠনের সদস্য করা— ডোনেশন সংগ্রহ করা যায়। ছাত্র-ইউনিয়ন-এর কর্তারা কলেজ-সোস্যালের জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা সংগ্রহ এবং ব্যয় করে। এই সোস্যালে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আজ এমন এক স্তরে নেমে এসেছে যার ফলে অনেক সময়ে বেলেল্লাপনায় ইন্ধন যোগায় না?

ছাত্র ইউনিয়নের নেতারা যে সবাই ধোয়া তুলসীপাতা হয় না তার নজির আছে। অতীতে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবার্ষিকী কমিটির কিছু 'কেচ্ছা' তখন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল। সে সময়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-এর নেতৃত্বে যাঁরা ছিলেন তাঁদের মধ্যে একজন তো বর্তমানে বড়বড় কথা বলে থাকেন। এমনকী মধ্য কলকাতার দুটি কলেজে চীপ স্টোর-চীপ ক্যান্টিন-এর দুর্নীতির কথাও জানা যায়। সেইসব দুর্নীতিগ্রস্ত নেতারা কমিউনিস্ট পার্টিতে তথা সিপিএম-এ বিরাজ করেছিল এবং বোধহয় এখনও করে থাকে। শুধু ছাত্র ইউনিয়ন নয়, শ্রমিক ইউনিয়নের 'বামপন্থী' নেতাদের দুর্নীতির কথা এখনও প্রকাশ পাচ্ছে। আসলে দলের নেতারাই দুর্নীতিগ্রস্ত, শাসন করবে কে? চানুনি কি সুঁচের বিচার করবে? আজকালকার ছাত্র-ছাত্রীরা বিশ্বায়নের ছত্রছায়াতে অবক্ষয়ী চিন্তা-মনন-সংস্কৃতিতে— দূষণে প্রপীড়িত। কিছু কলেজের সোস্যাল-এ এমন গান-নৃত্য-পরিবেশিত হয়েছিল— তার ফলে অনুষ্ঠান প্রসেপিয়াম-এ উল্লাসনৃত্য ও বেলেল্লাপনার দৃশ্য বিরল নয়।

তাই আজ ছাত্রদের সামনে প্রথম কথা হবে, 'ছাত্রানাং অধ্যয়নং তপঃ'। ছাত্রদের পঠন-পাঠন, ছাত্রদের সমস্যার দূরীকরণ, শিক্ষার উন্নয়ন— এইসব কর্মসূচী সামনে থাকা চাই।

রাজ্যে আগামী বিধানসভা নির্বাচনের সরকারি প্রক্রিয়া শুরু হতে চলেছে। এর সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক দলগুলির ক্রিয়াকলাপও এক নতুন মাত্রা পেতে চলেছে।

এখন এই ক্রিয়াকলাপের একটি লক্ষ্য ক্ষমতাকে টিকিয়ে রাখা এবং আয়ত্তে আনা। দ্বিতীয়ত, ক্ষমতা ধরে রাখার জন্য সন্ত্রাস পর্যন্ত যাওয়া— আর ক্ষমতাকে করায়ত্ত করার জন্য নিজেকে অজংলেহি করে তোলা। বামফ্রন্টের প্রধান পরিচালক সিপিএম নানান কৌশলে ক্ষমতা ধরে রাখার কৌশল করছে। জনসভায় নেতারা বলছেন, আমাদের ভুল নতজানু হয়ে স্বীকার করতে হবে। আবার বিরোধী নেত্রীকে আক্রমণাত্মক কুৎসিৎ গালাগালি দিচ্ছেন, এবং সর্বোপরি এলাকা দখল এবং পুনর্দখলের কাজে সশস্ত্র অভিযান চালাচ্ছেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে সিপিএম রাজ্য কমিটির সর্বশেষ সভায় বামফ্রন্টের ফিরে আসার কথা কেউই হলফ করে বলতে পারেননি। তাই রাজ্য-সম্পাদক বিমান বসু ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে রিপোর্ট পাঠানোর বিরুদ্ধে বলেছেন। বামফ্রন্টের শরিকরা সামনে সিপিএম-এর বন্ধু, কিন্তু তাঁরা সিপিএম-এর শিক্ষা হোক-এটাই চাইছেন।

অপরপক্ষে তৃণমূল নেত্রী বলছেন— "যৌথবাহিনী প্রত্যাহার করা না হলে— তিনি 'পদত্যাগ' করবেন। কারণ যৌথবাহিনী সিপিএম-এর ক্রীড়নক।" নেত্রী আরও বলেছেন, 'কংগ্রেস ছাড়াই তাঁরা ২০০ সিট পাবেন।" কংগ্রেসকে বলেছেন, "হয় তৃণমূল নয় সিপিএম— যেকোনও একটি গ্রহণ করতে হবে।"

এক তৃণমূল সাংসদ এবং পার্থ চ্যাটার্জি পূর্বেই বলেছেন, যৌথবাহিনী প্রত্যাহার করলেই সিপিএম জনরোষে উৎখাত হয়ে যাবে। মমতা এখনও বলছেন 'আমরা ইউপিএ-তে নেই... যে কোনওদিনই ছেড়ে চলে যেতে পারি!" রাজ্যের রাজ্যপাল বলছেন, শান্তি ফিরিয়ে আনার দায়িত্ব রাজ্য-সরকারের। তৃণমূল বলছে, স্পীকার নিরপেক্ষ নন। কারণ স্পীকার বলেছেন, শান্তির জন্য কোনও পক্ষই সচেষ্ট নন। তিনি আরও বলেছেন, কালো মেঘ জমেছে— এ-মেঘ কেটে যাবে।

যাই হোক এই কলামের লেখায় বলা হয়েছিল রাজ্যটাকে যুযুধান দুই গোষ্ঠী সিভিল ওয়ার-এর দিকে নিয়ে যাচ্ছে। এবারের নির্বাচনে আর কত শত প্রাণ বলি দেবেন রাজনৈতিক কাপালিকরা?

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

সঙ্কটাপন্ন কংগ্রেস ও 'হিন্দু সন্ত্রাসবাদ'

২০১০ সালের ডিসেম্বরের শেষে দিল্লীর বুড়ারিতে কংগ্রেসের ৮৩ তম পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন হইয়া গেল। সোনিয়ার নেতৃত্বে এইবারের অধিবেশনে কংগ্রেসের আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য আর এস এস এবং বিজেপি। দিগ্বিজয় সিংহ হইতে রাহুল ও সোনিয়া গান্ধী— এই অধিবেশনে হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা ও সন্ত্রাসের যোগসূত্র প্রতিষ্ঠা করিবার নানাভাবে চেষ্টা করিয়াছেন। সঙ্ঘের সম্পর্কে এই ধরনের অভিযোগ অবশ্য নতুন নহে। বহু আগে থেকে কংগ্রেস তাহা করিয়া আসিতেছে। বিশেষত সম্প্রতি কমনওয়েলথ গেমস, মুম্বাইয়ের আদর্শ আবাসন এবং ২ জি স্পেকট্রাম-কে কেন্দ্র করিয়া কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউ পি এ সরকার দুর্নীতির অভিযোগে জর্জরিত। সংসদের শীতকালীন অধিবেশনে জোটবদ্ধ বিরোধী দলগুলির ২ জি স্পেকট্রাম দুর্নীতির তদন্তে যৌথ সংসদীয় সমিতি (জে পি সি) গঠনের দাবীতে কংগ্রেস একেবারে কোণঠাসা। সেইসঙ্গে অন্ধ্রপ্রদেশে তেলেঙ্গানা রাজ্য গঠনের দাবী লইয়া ঘরোয়া দ্বন্দ্ব গোদের উপর বিষফোঁড়া। ইদানীংকালে কংগ্রেস এইরকম সঙ্কটে পড়ে নাই। 'ঐক্যবদ্ধ বিরোধী জোটে কংগ্রেস এখনও ফাটল ধরাইতে পারে নাই। বাজেট অধিবেশনেও এই ঐক্য ভাঙা যাইবে কিনা তাহা লইয়াও তাহারা সংশয়ে রহিয়াছে। যদি বিরোধীরা জেপিসি-র দাবীতে অটল থাকে এবং বাজেট অধিবেশনেও অচলাবস্থা থাকিয়া যায়, তাহা হইলে রাজনীতির কী চেহারা দাঁড়াইবে, কংগ্রেসের পক্ষে তাহা বড়ই উদ্বেগের বিষয়। জাতীয় রাজনীতির এই প্রতিকূল পরিস্থিতির মোড় ঘুরাইয়া দিবার জন্য তাই আর এস এস-সহ হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলির গাত্রে 'হিন্দু সন্ত্রাসবাদ'-এর তকমা আটকাইয়া দিবার ছক কষা হইয়াছে।

সংখ্যালঘু ভোটের লালসায় সাম্প্রদায়িক রাজনীতিতে অভ্যস্ত কংগ্রেস দল অতীতেও যখনই সঙ্কটে পড়িয়াছে তখনই সঙ্ঘের ওপর তীব্র অভিযোগের এমনকী নিষেধাজ্ঞা জারি করিয়া সঙ্ঘকার্যকে রুখিবারও ব্যর্থ প্রচেষ্টা করিয়াছে। দেশভাগের বিভীষিকা হইতে দায়িত্বমুক্ত হইবার জন্য অথবা এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায়ে নির্বাচনে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর জয়লাভ নিষিদ্ধ হইবার পর ক্ষমতা আঁকড়াইয়া থাকিবার জন্য কংগ্রেস এই কাজই করিয়াছে। এইবারেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই।

বছরখানেক আগে মালেগাঁও-এ একটি বোমা বিস্ফোরণের ঘটনার সঙ্গে অভিনব ভারতের নাম জড়িত থাকায় কয়েকজনকে গ্রেফতার করা হয়। যাহাদের বিরুদ্ধে 'মকোকা' আইনে মামলা চলিতেছে। গোয়াতে বিস্ফোরণে সনাতন সংস্থা যুক্ত বলিয়া অভিযোগ করা হইয়াছে।

অভিনব ভারত এবং সনাতন সংস্থা হিন্দুত্ববাদী সংগঠন হিসাবে পরিচিত। আর এস এস-ও হিন্দু সংগঠনে ব্রতী। এইজন্য কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন সরকারের প্রচলিত সূত্র অনুযায়ী সঙ্ঘকেও যুক্ত করা হইল। এই সূত্র অনুসারেই সঙ্ঘের প্রবীণ প্রচারক এবং কেন্দ্রীয় কার্যকরী মণ্ডলের সদস্য ইন্দ্রেশ কুমারের নাম আজমীর বিস্ফোরণে জড়িত বলিয়া অভিযোগ করা হইয়াছে। ইন্দ্রেশ কুমার জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের সঙ্গে সম্পর্কিত এবং তাহাদের বিভিন্ন অনুষ্ঠানেও তিনি যাইতেন। ইন্দ্রেশ কুমারের বিরুদ্ধে সিবিআই চার্জশীট দাখিল করিলেও এখনও কোনও চার্জ বা নির্দিষ্ট অভিযোগ করে নাই। কেবলমাত্র ভোটের রাজনীতির কারণেই আর এস এস তথা হিন্দু সমাজের উপর কলঙ্ক লেপন করিবার চেষ্টা করা হইতেছে।

স্মরণ রাখিতে হইবে হিন্দু সমাজই এই দেশের মূল স্রোত। সামাজিক মূল্যবোধ বা আমাদের সংস্কৃতি যার প্রতিফলন সংবিধানে লক্ষ্য করি, তাহার মুখ্য কারণ সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুসমাজ। তাই 'হিন্দু সন্ত্রাসবাদ'-এর নামে দেশের গরিষ্ঠ জনসমাজকে অপমান করা দেশদ্রোহিতার সামিল। এই চক্রান্তকে ব্যর্থ করিতে ধর্মীয় ও সামাজিক নেতাগণ এবং সেইসঙ্গে গণতন্ত্রকামী শুভবুদ্ধি সম্পন্ন নাগরিকেরা একযোগে প্রতিবাদ করুন। 'হিন্দু সন্ত্রাসবাদ'-এর তকমা লাগাইয়া দিয়া সঙ্ঘ তথা হিন্দুসমাজকে লাঞ্ছিত করা কোনও কাজের কাজ নয়।

জাতীয় জাগরণের মন্ত্র

সর্বদা শুনিতে পাওয়া যায় আমাদের দেশে যথোচিত উপকরণ ও বিশিষ্ট পরীক্ষাগারের অভাবে অনুসন্ধান অসম্ভব। একথা যদিও অনেক পরিমাণে সত্য, কিন্তু সম্পূর্ণ সত্য নহে। যদি ইহাই সত্য হইত তাহা হইলে অন্যদেশে যেখানে পরীক্ষাগার নির্মাণে কোটি মুদ্রা ব্যয়িত হইয়াছে, সে স্থান হইতে প্রতিদিন নতুন তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইত। কিন্তু সেরূপ সংবাদ শোনা যাইতেছে না। আমাদের অনেক অসুবিধা আছে সত্য, কিন্তু পরের ঐশ্বর্যে আমাদের ঈর্ষা করিয়া লাভ কি? অবসাদ ঘুচাও। দুর্বলতা পরিত্যাগ কর। মনে কর আমরা যে অবস্থাতেই থাকি না কেন সেই আমাদের প্রকৃত অবস্থা। ভারত-ই আমাদের কর্মভূমি, এখানেই আমাদের কর্তব্য সমাধা করিতে হইবে। যে পৌরুষ হারাইয়াছে, সেই পরিতাপ করে।

—আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু

আলোয় ঘেরা অন্ধকারে

ডঃ নির্মলেন্দু বিকাশ রক্ষিত

সংবাদপত্র থেকে জানতে পারলাম যে, বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ঋণের বোঝা হলো ১ লাখ, ৯৫ হাজার কোটি টাকা। না— সংখ্যাটা দুই-চার কোটি নয়, প্রায় দু লক্ষ কোটি। তার অর্থ হলো— রাজ্যের প্রত্যেকটা মানুষের মাথায় গড়ে ২০০ কোটিরও বেশি ঋণের বোঝা চেপেছে— সংখ্যাটা হলো ২০৩ কোটি ১ লাখ ৭৬ হাজার ১৯৭ টাকা।

আরও জানা গেছে কেন্দ্র সরকার ও বাজার থেকে ঋণ নেওয়ার পরিমাণ ভয়াবহভাবে বেড়ে গেছে। গত ৩৫ বছরে এই ঋণের পরিমাণ এক হাজার গুণেরও বেশি বেড়েছে। আরও লক্ষণীয় ব্যাপার হলো— ২০১০ সালের মার্চে যে আর্থিক বছর শেষ হয়েছে, সেই সময় থেকে আগামী বছরের মার্চ মাস পর্যন্ত ২০১১-র ঋণের পরিমাণ আরও বাড়বে ৩৩ হাজার কোটির মতো। রাজ্যের আর্থিক অবস্থা কী ভয়াবহ ধরনের, এই সব হিসেব থেকে সেটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। মনে রাখতে হবে— ১৯৭৭ সালে যখন বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসে, তখন মোট ঋণের পরিমাণ ছিল ১৪০৬ কোটি ৭১ লাখ টাকা। এখন সেটা ১ লাখ ৯৫ হাজার কোটিতে দাঁড়িয়েছে।

এই ভয়াবহ আর্থিক সঙ্কটের মধ্যে পড়ে যে কোনও রাজ্যবাসী দুটো প্রশ্ন তুলতে পারেন—(১) এই বিপুল ঋণ সুদ-সহ কিভাবে শোধ করা যাবে;এবং (২) এই ঋণের দ্বারা কোন্ কোন্ মহৎ কাজ সাঙ্গ করা হয়েছে?

প্রথম প্রশ্নের উত্তরটা জানি না। সহজ বুদ্ধিতে শুধু এটুকু বুঝি প্রত্যেক বছর সরকার তার সব খরচ মিটিয়ে যদি একটা বিপুল অঙ্কের অর্থ-ভাণ্ডার উদ্বৃত্ত রাখতে পারে, তবেই এই ঋণের বোঝা নামানো যাবে।

কিন্তু সেটা কি সম্ভব? মনে হয়— অযোগ্য-অক্ষম ব্যক্তিদের হাতে রাজ্যের শাসনভার চলে যাওয়ার ফলেই এই সঙ্কটটা আরও বাড়বে, ঢাকের দায়ে মনসা বিক্রী হয়ে যাবে।

রাজ্য-সরকার কি আরও ঋণ করে বর্তমান ঋণ শোধ করবে? সেটা তো হবে এক ভয়াবহ ব্যাপার! তাহলে ট্যাক্স বসাবে আরও? তাতেও সমস্যা আছে। যত ট্যাক্স বাড়ানো হবে, তত বাড়বে ট্যাক্স ফাঁকি— তাছাড়া নিম্ন-রুজির মানুষের ট্যাক্স দেওয়ার ক্ষমতারও একটা সীমা আছে। আর, তার ওপর এতে জিনিষের দাম আরও বাড়বে। বৈদেশিক ঋণ নেওয়া বা নোট ছাপানোর উপায়ও নেই।

প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ ডঃ ভি. কে. আর. ভি. রাও এক সময় লিখেছিলেন, রাষ্ট্রায়ত্ত উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানগুলো অবশ্যই মুনাফার জন্য (profit-motive) চলবে না, তাদের মূল লক্ষ্য হবে সেবাব্রত (service-motive)— এই যুক্তিটা অকাট্য। কিন্তু সেই সঙ্গে তাঁর বক্তব্য ছিল— এগুলোকেও লাভজনক হতেই হবে —তাতে উদ্বৃত্ত অর্থ উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক পরিকল্পনা রূপায়ণের কাজে লাগানো যাবে।

কিন্তু এই রাজ্যের সরকারী প্রতিষ্ঠানের অধিকাংশই তো ভর্তুকিতে চলে। কোটি কোটি টাকা বছরে ব্যয় করতে হয় তাদের চালানোর জন্য। সরকারী বাস, ট্রাম এবং অন্যান্য কিছু প্রতিষ্ঠান দেবে কি, তারা তো নেওয়ার জন্যই বসে আছে!

কৃষি ও শিল্পের যদি সুষ্ঠু বিকাশ ঘটত, তাহলে এই রাজ্যের চেহারা নিশ্চয় অন্য রকম হোত। কিন্তু কর্তাব্যক্তিদের অজ্ঞতা ও অপদার্থতার কারণে সেটাও হয়নি।

রাষ্ট্রসঙ্ঘের অর্থনীতিবিদদের একটা প্যানেল 'প্রসেসেস অ্যান্ড প্রব্লেমস্ অফ্ ডেভেলাপমেন্ট' গ্রন্থে যে ছকটা দিয়েছেন, তাতে আছে— (১) কৃষিকে প্রাধান্য দিতে হবে, ক্রমে সেটা পাবে শিল্প; অথবা (২) দুটোকে এক সঙ্গে শুরু করে দ্রুত শিল্পায়নের পথে এগোতে হবে।

এই রাজ্যে কিন্তু কোনটাই হয়নি।

কাল্পনিক সংখ্যাতত্ত্বের জোরে প্রচার চালানো হয়েছে যে, এই রাজ্যে কৃষির অভাবনীয় উন্নতি ঘটেছে— রাজ্যগুলোর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গই নাকি কৃষিতে প্রথম স্থান দখল করেছে। কিন্তু ডঃ বিবেক দেবরায় তাঁর 'পেপারে' দেখিয়েছেন যে, কৃষিতে এই রাজ্যের স্থান আটাশটা রাজ্যের মধ্যে মাঝামাঝিতে। আর বামপন্থী অর্থনীতিবিদ ডঃ অশোক মিত্র জানিয়েছেন— শুধু ধান, আলু আর সব্জিতেই আমরা স্বয়ম্ভর।

ডঃ গৌতম সরকার জানিয়েছেন— পাঞ্জাব, হরিয়ানা ও উত্তরপ্রদেশে 'সবুজ বিপ্লব' সফল হয়েছে; পরে মহারাষ্ট্র ও গুজরাটও অনেকটা সফল হয়েছে। সেই অনুপাতে পূর্বাঞ্চল কিন্তু তেমন কৃতকার্য হয়নি (ভারতের পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা, পৃঃ ১৬২)। এই বঙ্গ কি পূর্বাঞ্চলের মধ্যে পড়ে না?

কর্তাব্যক্তিরা অবশ্য কৃষির মোট উৎপাদনের হিসেব দেখিয়ে বাজিমাত করতে চান। কিন্তু মোট উৎপাদন নয়— আসল কথাটা হলো একর-প্রতি উৎপাদন কত? চীনে কৃষির মোট উৎপাদন নিশ্চয় তাইওয়ানের উৎপাদন থেকে বেশি। কিন্তু বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ অম্লান দত্ত মশায় লিখেছেন, একর প্রতি উৎপাদনে এশিয়াতে তাইওয়ানই আছে প্রথমে। আর সেটা হয়েছে জলসেচ, বিপণন-ব্যবস্থা, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রয়োগ, বয়স্ক-শিক্ষা ইত্যাদির মাধ্যমে— (প্রগতির পথ, পৃঃ ৩১)। আমরা এগুলোর ব্যবস্থা করতে পেরেছি?

প্রখ্যাত আরেক অর্থনীতিবিদ ডঃ ভবতোষ দত্ত মন্তব্য করেছিলেন— ক্রমে এক ফসলি জমিতে বিভিন্ন ঋতুতে বিভিন্ন ফসল ফলিয়ে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি আনতে হলো— (ভারতের আর্থিক উন্নয়ন, পৃঃ ২০)। কিন্তু রাজ্য সরকার হেঁটে চলেছে উল্টো পথে— কৃষি-জমিকে শিল্পপতিদের হাতে তুলে দিয়ে এই ভ্রান্ত শাসকরা রাজ্যটাকে দেউলিয়া করে দিতে চাইছে।

ডঃ আলোক চট্টোপাধ্যায় একটা চমৎকার কথা বলেছেন— কৃষিজাত দ্রব্যকে পণ্য হিসেবে ব্যবহার করেও রাজকোষ পূর্ণ করা যেত। তিনি অন্ধ্রের মাছ চাষের উদাহরণ দিয়েছেন। অন্ধ্রবাসীরা মাছ খান না— কিন্তু মাছ রপ্তানী করে ওই রাজ্যে প্রচুর সমৃদ্ধি এনেছেন। আমাদের রাজ্য কৃষিকে এভাবে ব্যবহার করলেও আর্থিক ক্ষেত্রে বিরাট সমৃদ্ধি আসত— (পশ্চিমবঙ্গের পিছিয়ে পড়ার কারণ কলুষিত রাজনীতি, আর্থিক অসঙ্গতি নয়, পৃঃ ৬৭)।

এই প্রসঙ্গে কিছু কথা চলে আসে।

প্রথমত, রাজ্যে প্রায় ৫৫ হাজার শিল্প-প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে আছে অর্থাভাব, চরম অব্যবস্থা, বিদ্যুৎ-সমস্যা ইত্যাদি কারণে। বেশকিছু বন্ধ হয়েছে শাসক দলের জঙ্গি ট্রেড-ইউনিয়নের কাণ্ড-কারখানার জন্য। এগুলোকে খোলার দরকার ছিল। সরকার অবশ্য কিছু কিছু রুগ্ন কারখানা অধিগ্রহণ করেছে— তবে রোগী কিন্তু মারা গেছে বা মৃতপ্রায় হয়ে গেছে। এগুলোকে খোলার ব্যবস্থা নিলে বেকার শ্রমিকেরা যেমন কাজ ফিরে পেতেন। তেমনি জমির সমস্যাও অনেকটা মিটত।

রাজ্যের প্রভুরা বলে থাকেন, এগুলো খোলার ব্যাপারে নাকি আইনগত অসুবিধে আছে। কিন্তু আমরা সবাই জানি— মানুষের জন্যই আইন, আইনের জন্য মানুষ নন। মানুষের স্বার্থে আইনের পরিবর্তনের কোনও প্রস্তাব বা প্রয়াস রাজ্য সরকার কি কখনও নিয়েছে?

দ্বিতীয়ত, একটা সুষ্ঠু বা সামগ্রিক শিল্প-পরিকল্পনা না নিয়ে রাজ্য-সরকার এখানে-ওখানে শিল্পপতিদের জমি দিতে চেয়েছে কৃষি ও কৃষককে ধ্বংস করার মাধ্যমে। পুরুলিয়া, বর্ধমান, বীরভূম ইত্যাদি জেলায় প্রচুর বন্ধ্যা ও অনুর্বর জমি থাকা সত্ত্বেও তার লোভের দৃষ্টি পড়েছে সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম প্রভৃতি জায়গায়। জন-প্রতিরোধে এই অপচেষ্টা বাধা পেয়েছে ঠিকই, কিন্তু উপযুক্ত জায়গায় এই সব শিল্প গড়ে উঠলে অনেকের চাকরি হোত, শিল্পোৎপাদনও বাড়ত।

তৃতীয়ত, বেশি দরকার ছিল সরকারী মালিকানায় কিছু ক্ষুদ্র শিল্পের প্রসার। এতে সরকারের মুনাফা বাড়ত, সেই সঙ্গে বাড়ত কর্ম-সংস্থান। প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ ধীরেশ ভট্টাচার্য মন্তব্য করেছেন, 'এতে অর্থ বিনিয়োগ কম লাগে, অথচ কর্মসংস্থান বেশি হয়— 'employment per unit of capital investment is higher' — (ইন্ডিয়া'জ ফাইভ ইয়ার প্ল্যান্স, পৃঃ ১৮৭)। সিঙ্গুরে টাটার প্রস্তাবিত কারখানায় কত মানুষের চাকরি হোত? হুণ্ডাই, মারুতি ইত্যাদি শিল্পে কোটি-প্রতি মাত্র দেড় জন কাজ পেয়েছেন। আর বিভিন্ন ধরনের ছোট

(এরপর ১৩ পাতায়)

এই ভয়াবহ আর্থিক সঙ্কটের মধ্যে পড়ে যে কোনও রাজ্যবাসী দুটো প্রশ্ন তুলতে পারেন—(১) এই বিপুল ঋণ সুদ-সহ কিভাবে শোধ করা যাবে; এবং (২) এই ঋণের দ্বারা কোন্ কোন্ মহৎ কাজ সাঙ্গ করা হয়েছে?

রাষ্ট্রীয় শিখর প্রতিভা সম্মান

স্বনামধন্য বিড়লা দম্পতি বসন্তকুমার বিড়লা ও ডঃ সরলা বিড়লা-কে 'রাষ্ট্রীয় শিখর প্রতিভা সম্মানে' ভূষিত করছে কলকাতার সর্বজন পরিচিত সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংস্থা 'শ্রী বড়বাজার কুমারসভা পুস্তকালয়'। আগামী ৯ জানুয়ারী, ২০১১ মহাজাতি সদন সভাগারে ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন হরিদ্বারের ভারতমাতা মন্দিরের প্রধান স্বামী সত্যমিত্রানন্দ মহারাজ। আরও আটজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকেও সম্মানিত করা হবে।

বসন্ত কুমার বিড়লা ও ডঃ সরলা বিড়লা

বৈভবসম্পন্ন স্বাভিমানী ভারত

(১ পাতার পর)

চিকিৎসা-বিজ্ঞান। বেদই আমাদের মূল আধার। চিকিৎসশাস্ত্রে চরক এবং শল্যচিকিৎসায় সুশ্রুতের নাম সর্বাগ্রগণ্য। পরাধীন ভারতে বৈদিক সভ্যতা ও সংস্কৃতি রক্ষায় আর্য সমাজ এবং তাঁর প্রতিষ্ঠাতা স্বামী দয়ানন্দের প্রভূত অবদান রয়েছে। আর্য সমাজ এক জনআন্দোলন। রামদেবজী অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলেন, ১৯৪৭ সালে 'Transfer of Power'-এর Agreement হয়েছে জওহরলাল নেহরু এবং লর্ড মাউন্টব্যাটেনের মাধ্যমে। স্ব-মানে নিজস্ব আর তন্ত্র মানে ব্যবস্থা— যা ভারতবর্ষে আজও হয়নি। শাসক বদল হয়েছে মাত্র। সবই ইংরেজ আমলের রয়ে গেছে। পৃথিবীর কোনও দেশই মাতৃভাষা ব্যতিরেকে অন্যভাষায় শিক্ষা দেয় না। সমৃদ্ধ সংস্কৃত ভাষাকে অবজ্ঞা অবহেলা করা হয়েছে।

স্বামী রামদেব আরও বলেন, 'যারা ইংরেজী ছাড়া উচ্চশিক্ষা সম্ভব নয় বলে' মনে করেন তাদেরও খণ্ডন করেন। তিনি বলেন, চীন, জাপান, জার্মানী, রাশিয়া যদি ইংরেজী ছাড়াই টেকনোলজিতে উন্নত হতে পারে তাহলে আমরাই বা পারবো না কেন? জাপানের গড় পারিবারিক আয় সব চেয়ে বেশি।

রামদেবজী দুর্নীতিকেই দেশের বর্তমান দুরবস্থার জন্য দায়ী করে বলেন, আজও ভারত পৃথিবীর সমৃদ্ধ দেশ। ভারতে সঞ্চিত কয়লা ও লোহার মূল্যই দু'হাজার কোটি টাকার বেশি।

এছাড়াও ভ্রষ্ট নেতাদের যে বিশাল পরিমাণ অর্থ বিদেশে সঞ্চিত তা দেশবাসীর এবং তা ফেরৎ আনা সম্ভব।

সভায় স্বাগত ভাষণ দেন রবি পোদ্দার, সভা পরিচালনা করেন শ্রীরাম আর্য এবং পৌরোহিত্য করেন স্বামী দিব্যানন্দ। মহাজাতি সদনে তিল ধারণের স্থান ছিল না। রামদেবজীর হাস্যরসপূর্ণ গম্ভীর বক্তব্য সকলেই উপভোগ করেন। রামদেবজী বারবার স্বদেশী ভোগ্যপণ্য ব্যবহারের কথাও জোর দিয়ে বলেন। তাঁকে মালা দিয়ে বরণ করা হলে তিনি মঞ্চ স্থ অনেকের গলায় সেইসব মালা পরিয়ে দেন। পুরো সভাগৃহে বিরাজ করছিল এক আন্তরিক পরিবেশ এবং দেশগঠনের আহ্বান।

অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতেই মমতাকে তোয়াজ

(১ পাতার পর)

দেয়নি। পরে বিহারে চরম নির্বাচনী বিপর্যয় এবং স্পেকট্রাম কেলেঙ্কারি কংগ্রেসের শিকড় সহ মাটি নাড়িয়ে দিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে গেলে মমতাকে তোয়াজ করতেই হবে কংগ্রেসকে। এই রাজ্যের শিশুরাও জানে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ডাঃ মানস ভুঁইয়া দলকে ১০টি আসনেও জেতাতে পারবেন না। প্রণব মুখোপাধ্যায় দিল্লীতে মস্ত বড় নেতা হলেও পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েত নির্বাচনেও কংগ্রেসকে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে জেতাতে পারবেন না। এমনকী নিজের জঙ্গীপুর লোকসভা আসনটিকে একক কৃতিত্বে রক্ষা করার সামর্থ্য নেই তাঁর।

হ্যাঁ, সেই কারণেই চিদাম্বরমকে শিখণ্ডী খাড়া করে কেন্দ্রীয় কংগ্রেস নেতৃত্ব তথাকথিত কড়া চিঠি পাঠিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে হার্মাদ প্রসঙ্গে তুলোধনা করেছে। মমতাকে তোয়াজ করতেই এমন একটি সাজানো নাটক করেছে কংগ্রেস। এই নাটকের চিত্রনাট্যটি লিখেছেন নিঃসন্দেহে প্রণব মুখোপাধ্যায়। এই প্রণববাবু সম্প্রতি তাঁর দলের ডাকাবুকো সাংসদ অধীর চৌধুরীকে খুশি করতে মমতার আনুষ্ঠানে যোগ দিতে মুর্শিদাবাদ সফর হঠাৎ বাতিল করে দিল্লি ফিরে যান। এই সেই প্রণববাবু যিনি মমতাকে খুশি করতে এখন সিপিএমকে রাজ্যের ক্রমবর্ধমান হিংসার জন্য দায়ী করছেন।

মুর্শিদাবাদের অনুষ্ঠান শেষ মুহূর্তে বাতিল করার জবাবে মমতা প্রণবাবুর হলদিয়ার অনুষ্ঠানসহ তাঁর সমস্ত অনুষ্ঠানই বয়কট করেছেন। তবু প্রণববাবু চুপ। তাঁর ভাবটা হচ্ছে, 'মেরেছ কলসির কানা, তাই বলে কী প্রেম দেব না'। ভোট বড় বালাই। এ লড়াই গদির লড়াই। তাই 'পত্র বোমা', 'পত্র বিতর্কের' কু-নাট্য রচনা। মমতা-বুদ্ধ-বিমানদের লড়িয়ে দিয়ে প্রণববাবুরা দূরে অপেক্ষায় থাকবেন জয়ীদের কাছে নিজেদের বখরা বুঝে নিতে। তবে মানুষ এখন যথেষ্ট সচেতন। তাই মুদ্রার টসে 'হেড হলে আমার জয়, টেল হলে তোমার পরাজয়' এই পুরাতন কৌশল এখন আর চলে না।

চীনা পণ্যের মজুত

(১ পাতার পর)

টেলিকম কেলেংকারী-তে কোনও ভূমিকা নেই তো সস্তার চীনা পণ্যের?

শুল্ক দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, তথ্য-প্রযুক্তি সংক্রান্ত 'সিন্‌ক্রোনাম ডিজিটাল হায়ারআর্কি ট্রান্সমিশন' যন্ত্রপাতি আমদানি করতে ৩ থেকে ২৬৬ শতাংশের মধ্যে 'অ্যান্টি-ডাম্পিং' শুল্ক নেওয়া হবে আমদানি-মূল্যের ওপর ভিত্তি করে। অন্যদিকে আমদানি মূল্য নিদ্ধারিত হবে সি আই এফ (সি অর্থাৎ কস্ট মানে উৎপাদন মূল্য বা দাম, আই অর্থাৎ ইনস্যুরেন্স মানে বীমা এবং এফ অর্থাৎ ফ্রেইট অর্থাৎ পণ্যমাসুল —এই তিনটেকে একত্রিত করে)-এর ভিত্তিতে। সরকারের এই নীতির ফলে এদেশের বাজারে এতদিন রমরম করে একচেটিয়া-ভাবে ব্যবসা করে আসা চীনা কোম্পানীগুলো যেমন আলকাটেল-লিউসেন্ট সাংহাই বেল কোং লিমিটেড, জে টি ই কর্পোরেশনের মতো কোম্পানীগুলি আর্থিক ক্ষতির সামনে পড়বে। শুধু ওই চীনা কোম্পানীগুলিই নয়, ইজরায়েল কেন্দ্রীক ই সি আই টেলিকম লিমিটেডও ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

চার্জশীটে শুধুই নাম

(১ পাতার পর)

অপরাধমূলক চক্রান্তে তাঁর নাম রাজনৈতিক কারণে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে যুক্ত করা হয়েছে বলে সি বি আই দপ্তর থেকে বেরিয়েই সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে ইন্দ্রেশজী জানিয়েছেন। কংগ্রেসের প্লেনারি সেশন চলাকালে ইন্টারনেটের গোপন কেলেঙ্কারি ফাঁস করে দেওয়া 'উইকিলিক্‌স' যে সব বিষয় প্রকাশ করছে তাও ইন্দ্রেশজীর মন্তব্যকেই সমর্থন করে। সেই সূত্র অনুসারে জানা গেছে— 'ভারতের পক্ষে বিপদের কারণ 'স্যাফ্রন টেরর' প্রচারের কথা। একথা কংগ্রেস-এর সাধারণ সম্পাদক রাহুল গান্ধী তৎকালীন আমেরিকান রাষ্ট্রদূত টিমোথি রোমারকে কথাপ্রসঙ্গে সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছিলেন। ফলে হুজি, ইন্ডিয়ান মুজাহিদ্দিন, লস্কর-এ তৈবা, প্রভৃতি পাকিস্তান ভিত্তিক সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের ক্যাডাররা দেশজুড়ে আক্রমণ অব্যাহত রাখলেও, মুম্বাই হানায় কাসভের মতো সন্ত্রাসবাদী ধরা পড়লেও সে ব্যাপারে কংগ্রেসীরা কোনও উচ্চবাচ্য করছেনা। অথচ, তাদের নেতা-নেত্রীরা রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ সহ বিভিন্ন হিন্দু সংগঠন ও হিন্দু সাধু-সন্তদের বিরুদ্ধে নানাভাবে অপপ্রচার করে চলেছেন। একশ্রেণীর সংবাদ মাধ্যমেও তাই প্রচার করানো হচ্ছে।

ইন্দ্রেশজী পরিস্কারভাবে জানিয়েছেন —''গাল-গল্প ফেঁদে আমাকে ডাকানো হয়েছে। আমি বরাবরই স্বচ্ছ খোলামেলা জীবনযাপন করি। দেশ ও জাতির জন্য আমি আমার সারাজীবন উৎসর্গ করেছি। বিগত কয়েকবছর যাবৎ কংগ্রেস দল ও তার নেতারা ব্যক্তিগতভাবে আমার এবং সঙেঘর ভাবমূর্তিকে ক্ষতি করার চেষ্টা করছেন। 'হিন্দুদের এবং গৈরিক' রঙকে সন্ত্রাসের সঙ্গে যুক্ত করা নিতান্তই ভুল এবং দেশ-বিদেশে বসবাসরত হিন্দুদের কাছে অপমানকর।'' ইন্দ্রেশজীর সঙ্গে ছিলেন মুসলিম রাষ্ট্রীয় মঞ্চের আহ্বায়ক-মহম্মদ আফজল। তিনি বলেন, 'ইন্দ্রেশজী কোনও সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপে যুক্ত, তা বিশ্বাস করি না'।

ক্ষমতা, দুর্নীতি ও মিথ্যাচার

যোগীন্দর সিং

আধুনিক ভারতে দুর্নীতি দেবতার মর্যাদা পেয়েছে। দেশের সর্বত্র বিভিন্ন দেব-দেবীর মন্দির রয়েছে যাদের মধ্যে কিছু বিখ্যাত, কিছু অন্ধকারে বিরাজমান, কিছু দেব-দেবী আড়ালে থেকে ভীতি প্রদর্শন করে। যাই হোক, দুর্নীতির দেবতা— যার ওপর নির্ভর করে আমাদের দেশের নেতা, আমলারা বেঁচে-বর্তে আছে তারা আড়ালেই থেকে যায়। অতীতে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল তৎকালীন ভারত সরকারের সচিবদের উদ্দেশ্যে লিখেছিলেন— "আজ আমার সচিব আমার বিরুদ্ধে তার মতামত জানাতে পারেন। আমি তাঁদের সেই স্বাধীনতা দিয়ে জানিয়েছি যে, যদি আপনারা আপনাদের সৎচিন্তা আপনাদের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীদের জানাতে ভয় পান, তবে আপনারা পদত্যাগ করবেন। আমি কখনও আপনাদের মতামতে অসন্তুষ্ট হব না তা সেটা যতই অস্বস্তিকর হোক।"

বর্তমান প্রশাসকরা 'থলি সংস্কৃতির' অংশীদার। এখনকার আমলারা তাঁদের রাজনৈতিক প্রভুদের তুষ্ট করতে কখনও খুল্লামখুল্লা আবার কখনও বা নেপথ্যে 'নোট' তৈরি করে সেইসব রাজনৈতিক প্রভুদের নির্দেশ মতো। যদি তাঁরা তাঁদের প্রভুদের নির্দেশ না মানেন তবে তাঁদের পাঠিয়ে দেওয়া হয় অকিঞ্চিৎকর অন্য কোনও পদে।

দুর্নীতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ না করে বরং এদেশে একটা চালু প্রথা হলো দুর্নীতির বিরুদ্ধে তদন্ত কমিশন গঠন করে সমগ্র তদন্ত প্রক্রিয়াকে বিলম্বিত করা এবং এই পদ্ধতি একইরকমভাবে কমনওয়েলথ গেম, আদর্শ আবাসন এবং স্পেকট্রাম ২-জি আর্থিক কেলেঙ্কারির ক্ষেত্রেও অবলম্বন করা হচ্ছে বা হবে।

আর্থিক অনিয়ম, প্রলোভন, উৎকোচ প্রদান প্রভৃতির কেলেঙ্কারি যুগে আন্তর্জাতিক এক সংস্থার হিসেব অনুসারে ১৯৪৮ থেকে ২০০৮ সাল অবধি এদেশ থেকে ২০ লক্ষ কোটি টাকার বেআইনি আর্থিক কাজকর্ম সংগঠিত হয়েছে যা আমাদের জাতীয় উৎপাদনের ৪০ শতাংশ। কিন্তু কেবল স্পেকট্রাম ২-জি কেলেঙ্কারিতে সরকারের ক্ষতির পরিমাণ উপরোক্ত আর্থিক অনিয়মের ১২ গুণ।

এই হিসেব অনুসারে, অবৈধ আর্থিক লেনদেন এদেশ থেকে প্রতি বছর সাড়ে ১১ শতাংশ হারে বেড়েছে। ১৯৯১ সালের পর থেকে সামগ্রিকভাবে ৫০ শতাংশ অবৈধ অর্থ এদেশ থেকে পাচার হয়েছে। সাড়ে ৩৩ শতাংশ অর্থ কেবল পাচার হয়েছে ২০০০ থেকে ২০০৮ সালের মধ্যে। সমীক্ষা বলছে যে, আর্থিক সংস্কার-ই এদেশ থেকে অধিক পরিমাণ কালো টাকা বিদেশে পাঠাতে সাহায্য করেছে।

দেশে একদলীয় সরকারী যুগের অবসানের পর দেশে খিচুড়ি সরকার চলছে। জোট সরকারের ধর্ম মানতে গিয়ে শরিকদলগুলিকে এমনসব দপ্তর দিতে হয়েছে যেখানে শরিকদলের মন্ত্রীদের ঐসব দপ্তরে একছত্র আধিপত্য কায়েম হয়েছে। যদি শরিকদলগুলির শক্তি এমন হয় যে, তারা নিজেদের ইচ্ছেমতো সরকার ভেঙ্গে দিতে পারে তবে ওই দলগুলির ব্ল্যাকমেল করতে পারে নির্দ্বিধায়। তাই বড় দলকে অনেক সময়ে শরিক ছোট দলগুলির সঙ্গে রফা করতে হয় এবং বড় দল বিলক্ষণ জানে যে, ক্ষমতায় থাকতে গেলে ছোট শরিকদলগুলিকে খোশামোদ করে চলতে হবে।

কোনও রাজনৈতিক দলই সিবিআই-কে সাংবিধানিক স্বীকৃতি দিতে চায় না। যেমন ক্যাগ, নির্বাচন কমিশন সাংবিধানিক সংস্থা। কিন্তু সিবিআই তেমন নয়।

যদি ক্যাগের (সি এ জি) রিপোর্টকে বিশ্বাস করা যায় তবে বলা যায় যে, ২-জি নিলামে সরকার ২০০৮ সালে ১.৭০ লক্ষ কোটি টাকা লোকসান করেছে (এই ক্ষতি ধরা হয়েছে ২০০১-এর মূল্যানুসারে)। আসলে টেলি যোগাযোগ মন্ত্রী এই নিলামে আইন ও অর্থমন্ত্রককে কোনওরকম পাত্তাই দেননি। এমনকী প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরকেও অন্ধকারে রাখা হয়েছে এমনটাও শোনা যাচ্ছে। বলা হচ্ছে যে, মন্ত্রীমহোদয় নিজের পছন্দমতো অযোগ্য কোম্পানীকে নির্দিষ্ট সময়সূচী এগিয়ে এনেও ওই কোম্পানীগুলির অনুকূলে কাজ করেছেন। ক্যাগ বলছে যে, নির্দিষ্ট সময়সূচী ঘোষণা করার আগেই ১৩টি কোম্পানী আগাম ডিম্যান্ড ড্রাফট কেটে রেখেছিল। স্পষ্টতঃ ওইসব কোম্পানীগুলির কাছে ডটের ছড্ডথবগ্ন-র নীলামের নোটিফিকেশনের আগাম খবর ছিল। শুধু তাই নয়, আবেদনপত্রে কী কী শর্ত থাকছে এবং ডিম্যান্ড ড্রাফটের পরিমাণ কত হবে সেটা জেনে আগেই ড্রাফট কাটা হয়ে গেছিল।

এসবের পিছনে কী কাজ করেছে,— কোম্পানীগুলির ওপর আনুকূল্য, নাকি অর্থ, নাকি অগাধ বিশ্বাস তা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ রয়েই যাচ্ছে। টেলি যোগাযোগমন্ত্রীর অপসারণের অব্যবহিত পরেই ট্রাই (TRAI) ভেজা বেড়ালের মতো টেলি যোগাযোগ দপ্তরকে জানিয়েছে যে, পাঁচটি কোম্পানীর ৬২টি লাইসেন্স বাতিল করা হোক।

আইন-কানুন থাকা সত্ত্বেও অধিকাংশ মানুষ নিজের স্বার্থে তা উপেক্ষা করে খুল্লাম-খুল্লা লাগু করতে আইনকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে বিভিন্ন দপ্তরকে সোনার খনিতে পরিণত করছে। অন্যথায় দিল্লিতে নভেম্বর ২০১০-এ অবৈধ ৩০০টি নির্মাণ প্রকল্পে বেঘোরে ৭০ ভাগ মানুষ প্রাণ হারালো কী করে তার ব্যাখ্যা কোথায়?

বিষয়টা ধামাচাপা দিতে তড়িঘড়ি এক সদস্যের একটি বিচারবিভাগীয় কমিশন গড়া হলো। দুর্ঘটনার ভয়াবহতা, বিশাল সংখ্যায় প্রাণহানি এবং অন্যান্য জটিল বিষয়গুলি এই কমিশনের বিচার্য।

একটা এক্সিকিউটিভের কাজ হলো কমিটি বা কমিশন গড়ে জনতার উত্মাতে জল ঢেলে দেওয়া যতক্ষণ পর্যন্ত না নতুন কোনও একই ধরনের দুর্নীতির ঘটনা ঘটে। ঘটনা হলো আদালতের মতো এদের অপরাধীকে শাস্তি দেবার ক্ষমতা থাকে না, এরা কেবল সরকারকে রিপোর্ট দেয়।

নিশ্চিতভাবে কোনও কমিশন আমাদের বলবে না যে বহুতলটি নির্মাণে কোনও অনুমতি নেওয়া হয়েছিল কিনা অথবা বলবে না এই বহুতলটির পরিকাঠামো বহুতল ধারণে সক্ষম কিনা। এমন কত কমিশন স্বাধীনতার পর গঠিত হয়েছে এবং এদের সুপারিশ কী তাও কেউ জানে না।

প্রায়শঃই হালকাভাবে বলা হয়ে থাকে বিষয়টা সিবিআই তদন্ত করছে। ঘটনা হলো, কোনও রাজনৈতিক দলই সিবিআই-কে সাংবিধানিক স্বীকৃতি দিতে চায় না। যেমন ক্যাগ, নির্বাচন কমিশন সাংবিধানিক সংস্থা। কিন্তু সিবিআই তেমন নয়। বিভিন্ন মামলা সিবিআই-কে তদন্তের ভার দিলেও পরে সরকারের কাছ থেকে অনুমোদন লাগে কোনও সরকারী পদস্থ ব্যক্তির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হলে। আসলে সিবিআই-কে সরকার তার নিজের মতো করে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে আসছে।

আমাদের দেশে আইন নেই এমন নয়, মুশকিল হলো সরকারের সদিচ্ছার অভাব। সরকার খোঁচা দেয়, কিন্তু সেই খোঁচায় ক্ষতের সৃষ্টি হয় না। দুর্নীতির বিরুদ্ধে সরকার বলে আসছে দুর্নীতি বরদাস্ত করা হবে না, কিন্তু এগুলি সবই ফাঁকা বুলি, কারণ দুর্নীতি নিবারণে কোনও ব্যবস্থাই গ্রহণ করা হয় না।

রাজনৈতিক নেতারা জানে যে, যে কুকুর কেবল ঘেউ ঘেউ করে— কামড়ায় না। এরা আসলে ভাল কুকুর। ঠিক যেমন যে মানুষ লম্বা-চওড়া কথা বলে তাকেই আমরা ভাল মানুষ, ভাল প্রশাসক বলে গণ্য করি। শুভ হোক ২০১১, আগামী বছর আপনাদের বাসনা যেন পূর্ণ হয়।

(লেখক সিবিআই-এর প্রাক্তন ডিরেক্টর)

অন্য রকম

জঙ্গলীবাবা

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ জেলার নাম শোণভদ্র। হাওড়া কিংবা শিয়ালদহ থেকে দিল্লী যেতে গেলে (ভায়া গয়া) এর রুক্ষ-ধূসর ভূমিকে এড়িয়ে যাবার কোনও উপায় নেই। তবে এখানকার প্রকৃতি যত না রুক্ষ, তার শতগুণে রুক্ষ এখানকার বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি। জেলাটির ভৌগোলিক অবস্থান ভারতবর্ষের নকশাল অধ্যুষিত তিনটি রাজ্য, অর্থাৎ ছত্তিশগড়, বিহার এবং ঝাড়খণ্ডের ঠিক কিনারে। আর এই রাজ্যগুলি শোণভদ্রকে ঘিরে থাকার কারণে চরম দারিদ্র্য এবং অপুষ্টি অনাহারের মধ্যেই নতুন উপদ্রব হিসেবে জুটেছে মাওবাদীরা। সঙ্গে রয়েছে সরকারী অবহেলা।

এই যার গ্রামের ছিরি, সেখানে মেয়ে জন্মানো মানেই বিরাট বড় একটা অভিশাপের মতো ব্যাপার। আজ্ঞে হ্যাঁ, এই একবিংশ শতাব্দীতেও। এই নারী স্বাধীনতার যুগেও। তবে অভিশাপ কখনও কখনও আশীর্বাদও হয়। বিশেষ করে যেখানে জঙ্গলীবাবার মতো লোকেরা থাকেন। জঙ্গলীবাবার নাম আসলে রামশঙ্কর। শোণভদ্রর প্রতিটি রমণীর কাছে তিনি ভগবান। কারণ তাঁদের বিয়ে দিয়ে একটা হিল্লে করে দিয়েছেন তিনি। ২০০৪ থেকে আয়োজিত হয়ে আসছে এই গণবিবাহের কার্যক্রম। অন্তত দু'শো মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন তিনি। এই রমণীরা প্রত্যেকেই হতদরিদ্র পরিবারের। পরের এই মেয়েদের জন্য লোকের কাছে হাত পাততেও দ্বিধা নেই তাঁর।

একটি দরিদ্র পরিবারে জন্ম হয়েছিল রামশঙ্করের। তাই শৈশব থেকেই একদিকে যেমন দারিদ্র্যের সঙ্গে পরিচয় ঘটেছিল তাঁর, তেমনি অন্যদিকে জন্মস্থান কিচার গ্রামের

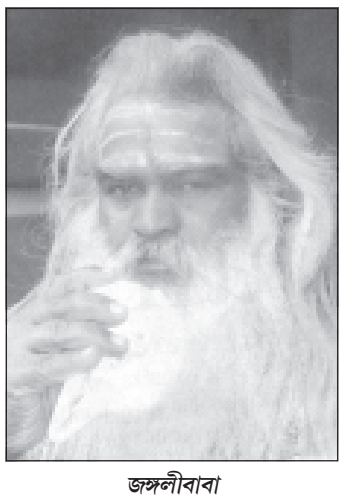

জঙ্গলীবাবা

আর পাঁচটা মানুষের দারিদ্র্যের দুঃখ-কষ্ট রামশঙ্করের হৃদয়ের ব্যথা-বেদনার উদ্রেক করতো। ১৯৭৬ সালে তিনি ম্যাট্রিকুলেট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ছ'বিঘে জমি ছিল রামশঙ্করের পরিবারের। জমিতে যা চাষবাস হোত তাতে তাঁর পরিবারের বছরভর সঙ্কুলান হওয়া সম্ভব ছিল না। তবু হয়তো কষ্টে-সৃষ্টে নিজের লেখাপড়াটা চালিয়ে যেতে পারতেন রামশঙ্কর। কিন্তু ছোটবেলা থেকে দেখা দারিদ্র্য তাঁকে জীবিকার সন্ধানে ব্যাপৃত হতে বাধ্য করলো। সঙ্গে রইলো ঈশ্বরকে অনুসন্ধান করার প্রয়াস।

সেই ঈশ্বরকে খুঁজতেই বেনারসে চলে এলেন রামশঙ্কর, বাবা বিশ্বনাথের টানে। মন্দিরের মধ্যেই তাঁর কাছে 'ওপরওলার' নির্দেশ এল— নিজের বাসস্থানের খুব কাছে রামগড় বাজারে একটা শিব-মন্দির প্রতিষ্ঠার। সালটা ছিল ১৯৯৫। তিনি ফিরলেন রামগড়ে। পয়সা'র অভাব হলো না। স্থাপিত হলো শিবমন্দির। সংসারের মায়া ত্যাগ করে সাধক হলেন তিনি। ২০০৪ সাল নাগাদ মন্দির চত্বরেই ঘটলো একটা অদ্ভুত ঘটনা। মন্দির চত্বরে আত্মহত্যা করার চেষ্টা করে জনৈক যুবক। পরে জানা যায় তার ঘরে রয়েছে পিতৃ-মাতৃহীন অবিবাহিতা বোন।

নিদারুণ দারিদ্র্যে বোনের বিয়ে দিতে না পারাতেই আত্মঘাতী হওয়ার চেষ্টা করে তার ভাই-টি। ছেলেবেলায় দেখা দারিদ্র্য অকস্মাৎই স্মৃতিপটে এসে পড়ে রামশঙ্করের।

২০০৫ থেকে গণবিবাহ দিতে থাকেন জঙ্গলীবাবা। ওই বছর ২১ জন মেয়ের বিয়ে দেন। পরের বছর থেকে এই সংখ্যাটা ক্রমেই বাড়তে থাকে। ২০০৬-এ ১৫৩টি ও ২০০৭-এ ১০১টি মেয়ের বিবাহ দেন তিনি। শোণভদ্র-এর রমণীদের কাছে আজ জঙ্গলীবাবা সত্যিই ভগবান।

চাষের জমিতে মদের কারখানা

প্রতিবাদে ব্যাপক বিক্ষোভ কামরূপে

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ এবারে অসমে এন ভি ডিস্টিলারিজ অ্যান্ড ব্রেভেরিজ্ (নর্থ ইস্ট) প্রাইভেট লিমিটেড (নিউ দিল্লী) এর চাষের জমিতে মদের কারখানা তৈরির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালো অসমের কামরূপ

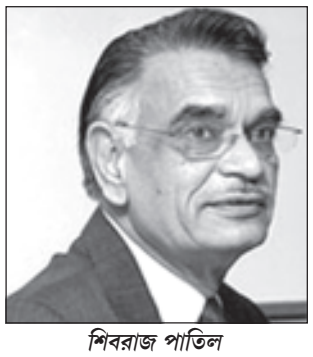

শিবরাজ পাতিল

জেলার পলাশবাড়ির মানুষ। এই আন্দোলনে নেতৃত্ব দিচ্ছেন পলাশবাড়ির নির্দল বিধায়ক প্রণব কলিতা। বিশ্বস্ত সূত্রমতে, কংগ্রেসের সর্বভারতীয় নেতা এবং প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শিবরাজ পাতিলের ধর্মপত্নী অর্চনা পাতিল এবং তাঁদের পুত্র শৈলেন্দ্র পাতিল ওই মদনির্মাণকারী কোম্পানীটির প্রকৃত মালিক।

গত ১৯ ডিসেম্বর কামরূপ জেলার রামপুরে এক বিরাট বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশের উদ্যোক্তা ছিল— 'দক্ষিণ কামরূপ বিকাশ গোষ্ঠী'। নেতৃত্বে অবশ্যই প্রণব কলিতা। সংশ্লিষ্ট এলাকায় চাষীদের কাছ থেকে কম দামে জোরজবরদস্তি করে কৃষিজমি বিক্রি করানোর প্রয়াস চলছে বলে অভিযোগ। এজন্য গুয়াহাটি এবং আশপাশের মাটি-মাফিয়াদের আসরে নামানো হয়েছে। দোরাবিল নামক বিস্তীর্ণ জলাশয়ের পাশেই এই মদ কারখানা তৈরির প্রয়াস চলছে। দোরাবিল এবং সংলগ্ন কুলসি নদীতে রয়েছে বিরল প্রজাতির ডলফিন এবং ওখানের মাছ স্থানীয় মানুষজনের জীবিকার অন্যতম অবলম্বন। তাদের বক্তব্য— তাদের ওই এলাকায় কাউকেই তারা তাদের জীবিকা থেকে উৎখাত করার সুযোগ দেবেন না।

বিক্ষোভকারীরা প্রস্তাবিত মদ কারখানার জন্য প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শিবরাজ পাতিল, বিতর্কিত সাংসদ মণিকুমার সুব্বা এবং কমনওয়েলথ্ গেমস সংগঠন কমিটির বরখাস্ত চেয়ারম্যান সুরেশ কালমাদিকে দায়ী করেছেন। ৮০ বিঘা জমি রামপুর এলাকাতে বিঘাপ্রতি ৬০ হাজার থেকে ১ লক্ষ টাকা দরে কেনা হয়েছে। যারা জমি বিক্রি করেছে তাদেরকে বলা হয়েছে— ওখানে কোম্পানী তার পুলিন, মিনারেল ওয়াটার এবং নার্সিংহোম তৈরি করবে। পরে তারা জানতে পারেন, আদতে ওখানে মদের কারখানা হবে। এলাকার মানুষ জানিয়েছেন, কোম্পানী আরও জমি কিনতে চেষ্টা চালাচ্ছে।

অসমে সংরক্ষিত বনাঞ্চলের ৫০ শতাংশই বেদখলে

সংবাদদাতা ॥ অসমের ৯০টি সংরক্ষিত বনাঞ্চলের ৫০ শতাংশ ভূমিই বেদখলকারীর কবলে পড়েছে বলে এক ভয়ঙ্কর তথ্য বের হয়ে এসেছে। উল্লেখ্য যে অসমের মোট জায়গার ২৬,১৩০৫৮ হেক্টর ভূমি গভীর বনাঞ্চলে আচ্ছাদিত। এর ৫,৮৯৩৯৯ হেক্টর ভূমি সংরক্ষিত বনাঞ্চল প্রস্তাবিত বনাঞ্চলের অন্তর্গত। কিন্তু অতি পরিতাপের বিষয় যে রাজ্যের এই ৯০টি সংরক্ষিত বনাঞ্চলের ৮ লক্ষ হেক্টরের অধিক বনভূমি সম্প্রতি এক শ্রেণীর রাজনৈতিক নেতার ছত্রছায়াতে ২৫ লক্ষেরও অবৈধ বেদখলকারীর কবলে পড়েছে। ইতিমধ্যে স্বয়ং কেন্দ্রীয় বন ও পরিবেশ দপ্তরের মন্ত্রী জয়রাম রমেশ অসমের রাষ্ট্রীয় উদ্যান ও অভয়ারণ্যসমূহ বেদখলকারীর কবলে পড়ার কথা স্বীকার করে রাজ্যের মোট বনাঞ্চলের ৪,৮৫,৬৭৪ হেক্টর বনভূমি বেদখল হওয়ার কথা প্রকাশ করেছেন। এক শিঙের গণ্ডারের জন্য বিশ্বখ্যাত কাজিরাঙা রাষ্ট্রীয় উদ্যানের ২,১০০ হেক্টর বনভূমি বেদখল বলেও সরকারি তথ্যে জানা গেছে। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই যে ১৯৮০ সালে সরকার প্রবর্তন করা বনরক্ষা আইনকে সম্পূর্ণ অবজ্ঞা করে এক শ্রেণীর স্বার্থলোভী রাজনৈতিক নেতাদের প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায় রাজ্যের রাষ্ট্রীয় উদ্যান, অভয়ারণ্য ও সংরক্ষিত বনাঞ্চলগুলি অবাধে বেদখল হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে অসমের এই বনাঞ্চলগুলিতে হাতি, গণ্ডার, বাঘ প্রভৃতি বন্য জন্তু তো রয়েছেই; সেইসঙ্গে এই বনাঞ্চল থেকে পাওয়া যায় ৪২টি প্রজাতির বাঁশ, ১৯৩টি বিভিন্ন অর্কিড, প্রায় ৩,০১৭ ধরনের ফুল, ১৯৩টি প্রজাতির স্তন্যপায়ী জীব, ১১ প্রজাতির বাঁদর, কয়েকশত প্রজাতির পাখী, কীট পতঙ্গ ইত্যাদি।

ইতিমধ্যে রাজ্যের বনাঞ্চলে দ্রুতহারে হওয়া বেদখল ও বনধ্বংস অভিযান পারিপার্শ্বিক দিকে শুধু বিরূপ প্রভাব ফেলেনি, অসমের অমূল্য সম্পদ স্বরূপ এই বৃহৎ জৈব বৈচিত্র্যের প্রতিও মহাসঙ্কট বয়ে এনেছে। উল্লেখ্য যে রাজ্যে দ্রুত হারে হওয়া বনধ্বংসের বিষয়টি নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। সেজন্য যদি সময় থাকতেই অসমের বনাঞ্চলসমূহ বেদখল মুক্ত করে রক্ষা না করা যায়, তবে একদিন হবে এর ভয়ঙ্কর পরিণাম।

সংখ্যালঘু হলেও উন্নয়নের ছিটেফোঁটাও জুটছেনা মালদার জনজাতিদের

তরুণ কুমার পণ্ডিত ॥ মালদা জেলাতে সংখ্যালঘুদের উন্নয়নে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার যখন ঢালাও প্রতিশ্রুতি ও বেশকিছু অর্থ বরাদ্দ করেছেন তখন জনজাতি সাঁওতালদের জন্য এই জেলাতে ছিঁটেফোটাও জুটছেনা। ইংলিশবাজার ব্লকের খাসপাড়া গ্রামের বাসিন্দা শুকলাল পাহাড়ি (৪৭) অভাবের জ্বালায় স্বেচ্ছা মৃত্যুর জন্য আবেদন জানিয়েছেন। দীর্ঘ ৩০ বছর ধরে রোগভোগ করলেও সরকারি কোনও সুযোগ সুবিধা এই পরিবার পায়নি। শুকলাল বলেন, 'দীর্ঘদিন থেকে আমার পা প্যারালাইসিসে অচল, অর্থের অভাবে চিকিৎসা করাতে পারছিনা। এখন দু'বেলা খাবার জোটে না। অনেকদিন থেকে না খেয়ে আছি। শীতের মধ্যে ছেঁড়া জামা কাপড় পরেই রাত কাটাই। রাজনৈতিক নেতাদের কাছে অনেকবার গিয়েছি। কোথাও কোনও সাহায্য পাইনি। এভাবে আমার পক্ষে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। তাই গ্রাম পঞ্চায়েত ও বি ডি ও-কে আমার স্বেচ্ছামৃত্যুর কথা জানিয়েছি।' ঘটনার কথা শুনে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন মালদার জেলাশাসক প্রমল কুমার সামন্ত, তিনি বলেন, সত্যি এটা খুব দুঃখজনক ঘটনা। এই ধরনের ঘটনা কোনওভাবে বরদাস্ত করা হবে না। জনজাতিদের জন্য অনেক সরকারি প্রকল্প থাকা সত্ত্বেও কেন এই শুকলাল সেই সুবিধা পাচ্ছেনা এ ব্যাপারে খোঁজ নেব। ৩৪ বছরের বাম জামানায় জনজাতিদের যে কোনও উন্নয়ন হয়নি, এই খাসপাড়ার ঘটনা তার জ্বলন্ত উদাহরণ। অপর এক ঘটনায় মালদা শহরের ২৩নং ওয়ার্ডের সূর্য সেন কলোনিতে ৫০ বছরের পুরানো একটি জনজাতি ছাত্রাবাস দখল করে নেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। বৃটিশ আমলে স্থাপিত হোস্টেলটি রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে একজন মিশনারী পাদ্রী রয়েছেন। বর্তমানে ১০ জন ছাত্র রয়েছেন। তিনবিঘা জায়গার ওপর এই হোস্টেলটিকে ভেঙে ফ্ল্যাট তৈরির চক্রান্ত চলছে বলে ছাত্রদের অভিযোগ। প্রশাসন ও জেলাশাসক জনজাতিদের জমি জাতে বেহাত না হয় তা দেখা হবে বলে জানিয়েছেন।

অযোধ্যার রামজন্মভূমি ভাগ নয় কোনওমতেই

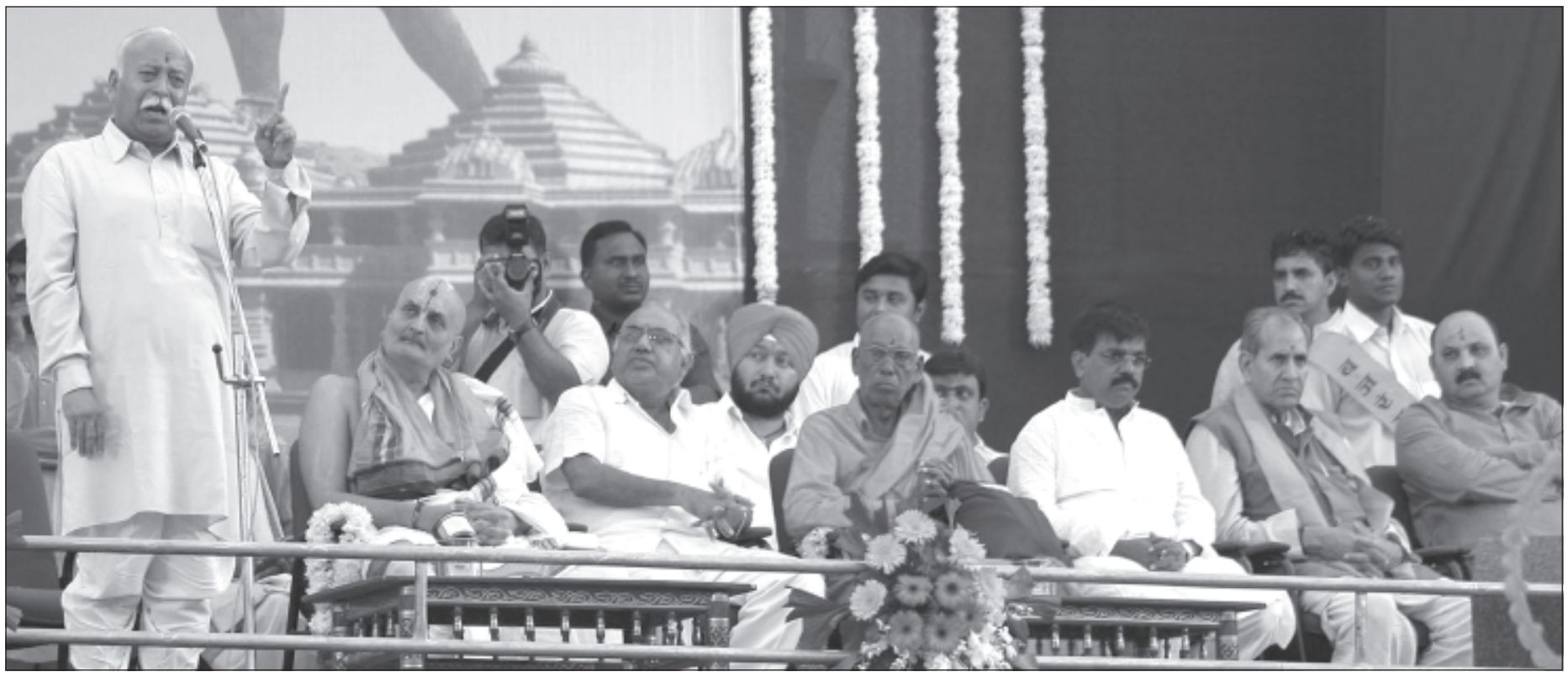

গত ১২ ডিসেম্বর নাগপুরে আয়োজিত ধর্মসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে এই কথাগুলি বলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক মোহনরাও ভাগবত।

মদের দোকানের রাশ টানতে উদ্যোগী বিহার সরকার

নিজস্ব প্রতিনিধি।। দেউলিয়া পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে যখন রাজস্ব আদায়ের জন্য ভাটিখানা খোলার ব্যাপারে অবাধে লাইসেন্স বিতরণ করা হচ্ছে, তখন ধর্মীয় স্থানে মদসহ যে কোনও পানীয় বিক্রয়কেই নিষিদ্ধ করে অনন্য নজির সৃষ্টি করল সদ্য পুনর্নির্বাচিত বিহার সরকার। নীতিশ কুমার-সুশীল মোদী জুটির নতুন ইংরেজী নববর্ষের প্রস্তাব হলো— রাজ্যের সমস্ত স্কুল ও ধর্মীয় চত্বর থেকে মদ্যসমেত সমস্ত পানীয়ের দোকান নিষিদ্ধ করে দেওয়া।

আগামী ১৫ জানুয়ারি থেকে এনিয়ে অভিযানে নামবে বিহার সরকার। সরকারের প্রথম কাজ হলো প্রাথমিক থেকে উচ্চমাধ্যমিক পর্যন্ত সমস্ত স্কুল চত্বর, মন্দির এমনকী মসজিদ চত্বরেও ৫০০ মিটারের মধ্যে যাবতীয় মদের দোকানগুলো চিহ্নিত করা। আর দ্বিতীয় কাজ হলো, এরপর দোকানগুলোকে অন্যত্র স্থানান্তরকরণের বন্দোবস্ত করা। যেসব দোকানের লাইসেন্স রয়েছে তাদের স্থানান্তরিত করবে সরকার। অন্যদিকে যেসব দোকানের লাইসেন্স নেই তাদের সরিয়ে দেবে বিহার সরকার।

মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমার ইতিমধ্যেই আদেশ জারি করে বলেছেন, পানীয়ের দোকান থেকে 'উস্কানিমূলক বিজ্ঞাপন'-ও অবিলম্বে সরিয়ে ফেলতে হবে। এবং সমস্ত পানীয়ের দোকানে একটা বিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ আবশ্যিক ভাবে দিতে হবে যে— "মদ্যপান শরীরের পক্ষে ক্ষতিকারক"।

প্রসঙ্গত, ২০০৭ সালে নীতিশ কুমার আবগারি শুল্ক নীতিতে বেশ কিছু সংস্কার এনে তা সহজ করে দেন যার ফলে রাজ্যজুড়ে ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে ওঠে ভাটিখানাগুলো।

এই ইস্যুকে হাতিয়ার করেই সাম্প্রতিক বিহার বিধানসভার নির্বাচনী প্রচারে বিরোধীরা এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কিছু লোকের টার্গেট হয়ে যান নীতিশ এবং তাঁর সরকারের সহযোগীরা।

যদিও এরজন্য প্রথম নীতিশ সরকারকে খুব একটা দায়ী করা চলে না। কারণ সরকার সবশুদ্ধ ৬০০০ ভাটিখানা খোলার অনুমতি দিয়েছিল। কিন্তু গলদ ছিল সরকারের আবগারি শুল্ক নীতিতে। প্রতি তিনটে পঞ্চায়েত পিছু একটি ভাটিখানা খোলার নীতি প্রযোজ্য হতেই ভাটিখানার সংখ্যাটি ২০,০০০ পেরিয়ে যায়।

রাজ্যের মানুষ নীতিশ-সুশীল জুটির প্রতি সাম্প্রতিক বিধানসভা ভোটে আস্থা দেখানোর পর-ই এব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা শুরু করেন তাঁরা। আবগারি আধিকারিকদের একটি সমীক্ষা-বৈঠকে নীতিশ কুমার বলেন, তাঁর প্রথমবারের সরকার (২০০৫-২০১০) -এর আমলে আবগারি শুল্ক নীতির পরবর্তী পর্যায়ে যেসব মদের দোকান গড়ে উঠেছে সেগুলি চিহ্নিত করতে।

সেইমতো কাজ শুরু হয়। এনিয়ে নীতিশের বক্তব্য খুব পরিষ্কার— "যদিও আবগারি শুল্ক সরকারকে ভালরকম-ই রাজস্ব দেয় কিন্তু একটা সামাজিক দায়বদ্ধতাও রয়েছে সরকারের। ধর্মীয় স্থান ও স্কুল চত্বরে এজন্যই মদের দোকানগুলো চিহ্নিত করে সেগুলো সরানোর বন্দোবস্ত করছে বিহার সরকার।"

রাজ্যের আবগারি শুল্কমন্ত্রী বিজেন্দ্র প্রসাদ যাদব সাংবাদিকদের জানিয়েছেন,

গত ১২ ডিসেম্বর দিল্লীর রামলীলা ময়দানে অনুরূপ সমাবেশে বক্তব্য রাখছেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের আন্তর্জাতিক সভাপতি অশোক সিংঘল, সাধ্বী ঋতাম্ভরা প্রমুখ।

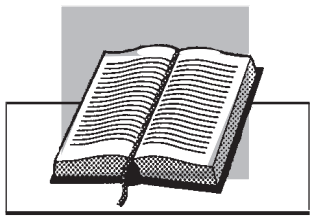

পুস্তক প্রসঙ্গ

যে মহাত্মা সারা জীবন দ্বিচারিতা করে গেছেন

এন. সি. দে।। আমাদের সেই পরিচিত লেখক প্রিয়রঞ্জন কুণ্ডু অবশেষে ২০১০ সালে লিখলেন তার জীবনের সবচেয়ে নিদারুণ অধ্যায়ের কাহিনী। এইটাই নাকি ছিল তার জীবনের সবচেয়ে বড় স্বপ্ন। জীবনের নানান টানাপোড়েনের পর আজ ৮৭ বছর বয়সে তিনি তার স্বপ্ন সফল করলেন। লেখক নিজেও ছিলেন একজন স্বাধীনতা সংগ্রামী। সেই কৈশোরে তিনিও ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন দেশ মাতৃকার বন্ধন-দশা ছিন্ন করার শপথ নিয়ে। কিন্তু তাঁর মতে, গান্ধী-নেহরুর ষড়যন্ত্রে ১৯৪৭ খৃস্টাব্দে তা বানচাল হয়ে যায়। আর তখনই তিনি শপথ নেন, পৃথিবী থেকে বিদায় নেবার আগে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী ও তাঁর যোগ্য উত্তরসূরী জওহরলাল নেহরু ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামে দেশবাসীর প্রতি যে চরম বিশ্বাসঘাতকতা করে গেছেন তার বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করে যাবেন। তার মতে, "একজন স্বাধীনতা সংগ্রামী হিসেবে ভারতমাতার দুই কুলাঙ্গার সন্তান সম্পর্কে অতি সংক্ষেপে দু'চার কথা বলে না গেলে দেশবাসী আমায় ক্ষমা করবেন না"।

অশীতিপর বৃদ্ধ লেখক প্রিয়রঞ্জন কুণ্ডু নিজেই তার ঈপ্সিত সেই বইটি "যে মহাত্মা সারাজীবন দ্বিচারিতা করে গেছেন"-র মুখবন্ধে উপরোক্ত কথাগুলি লিখেছেন। অনুসন্ধিৎসু পাঠক নিশ্চিতভাবেই কৌতূহলী হয়ে উঠছেন শ্রী কুণ্ডুর দেওয়া সেই সমস্ত অজানা তথ্য জানতে কিভাবে গান্ধী ও নেহরু ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামে দেশবাসীর প্রতি চরম বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। পাঠকবৃন্দের সেই কৌতূহল পুস্তক পর্যালোচনার সীমিত পরিসরে সম্পূর্ণ মেটানো সম্ভব নয়। অনুসন্ধিৎসু পাঠকের কাছে বইটি অবশ্য পাঠ্য।

এবার বইটির বিষয়ে প্রবেশ করা যাক। লেখক বইটির ছত্রে ছত্রে নানান নবনব মন্তব্য করেছেন, যা চিন্তাশীল পাঠকের মনে গভীর চিন্তার উদ্রেক করবেই, বইটির শুরুতেই বিতর্ক। যে সিপাহী বিদ্রোহকে কার্লমার্ক্স থেকে বীর সাভারকারের মতো মানুষজন স্বাধীনতার প্রথম যুদ্ধ বলে বর্ণনা করেছেন, সেই সিপাহী বিদ্রোহকে শ্রীকুণ্ডু বিভ্রান্তিকর বলে বর্ণনা করেছেন। তার মতে, 'ওটা রাজশক্তির অপশাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ব্যতীত অন্য কিছু নয়।'

গান্ধীজীর বিলেতে গিয়ে ব্যারিস্টারী পড়ার ঘটনা সম্পর্কে তিনি মন্তব্য করেছেন ঃ "শিক্ষায় যিনি তৃতীয় শ্রেণীর ম্যাট্রিকুলেট, পারিবারিক আর্থিক স্বচ্ছলতা যাঁর প্রতিকূল, তাঁর পক্ষে মুসলিম অর্থানুকূল্যে লণ্ডন গিয়ে ব্যারিস্টারী পড়াকে মোটেই একটি স্বাভাবিক ঘটনা বলা যায় না যদি না এর পিছনে কোনও অশুভ শক্তির হাত থেকে থাকে।" "তাঁকে জীবনের শুরু থেকেই একটা উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত তৈরি করা হচ্ছিল, যার ফলশ্রুতিতে দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যাগ্রহের শিক্ষানবিশী দিয়ে শুরু, এবং শেষ হয়েছিল ইংরেজ ও মুসলমানদের মনস্তুষ্টি সাধনে।" তার যুক্তি এক মুসলিম ব্যবসায়ীর একটি মামলার ওকালতি করতে তিনি দক্ষিণ আফ্রিকায় চলে গেলেন। একজন নতুন আইনজীবীকে নিযুক্ত করে প্রায় ৪০ হাজার পাউন্ডের একটি মামলার ওকালতি করার জন্য সাধারণভাবে কোনও অভিজ্ঞ ব্যবসায়ীই এগিয়ে আসবেন না। কিন্তু এক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম হলো, গান্ধীজীকেই তারা মনোনীত করলেন। আবার মামলাটি আপোষে নিষ্পত্তি হওয়ার পরও দেশে না ফিরে দক্ষিণ আফ্রিকাতেই থেকে গেলেন

বর্ণবিদ্বেষী আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য। এখানেই তার প্রশ্ন ঃ "বর্ণবিদ্বেষীদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে চেয়ে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন, তাঁর জন্মদিনে শুভেচ্ছা এবং উপঢৌকন প্রেরণ প্রভৃতি কাজ কতখানি স্বাভাবিক ছিল?" তার মতে "বর্ণবিদ্বেষের আন্দোলন, যা দানা বেঁধে উঠেছিল, ধীরে ধীরে তাতে জল ঢেলে দেবার জন্যেই মোহনদাসকে দক্ষিণ আফ্রিকায় রেখে দেওয়া হয়েছিল। একই অদৃশ্য শক্তির অঙ্গুলি হেলনে, যাতে সেই আন্দোলন ক্রমান্বয়ে শক্তিশালী হয়ে শাসককুলকে বিপদগ্রস্ত করতে না পারে।"

এইরকম আরও অজস্র উদাহরণ লেখক তার উক্ত বইটিতে তুলে ধরে দেখিয়েছেন যে গান্ধী মোটেই মহাত্মা ছিলেন না। এমন কয়েকটি উদাহরণ তুলে ধরেই এই পর্যালোচনা শেষ করব।

প্রথম উদাহরণ রাউলাট বিল। ইংরেজ সরকার ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের শায়েস্তা করার জন্য এনেছিল এই বিল। 'এর বিরুদ্ধে বিপ্লবীরা যাতে সঙ্ঘবদ্ধ হতে না পারে এই উদ্দেশ্যে গান্ধী সাত তাড়াতাড়ি এক প্রতিবাদ দিবস ডেকে বসলেন ৬ এপ্রিল, ১৯১৯ খৃস্টাব্দে। ফলে জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড এবং অসংখ্য বিপ্লবীদের প্রাণ গেলো, জেলে গেলেন, অন্তরীণদশায় জীবনাপাত করলেন। রাউলাট বিলের বিরুদ্ধে আন্দোলন পথভ্রষ্ট হলো। এটি গান্ধীজীর দ্বিচারিতার অন্যতম ন্যক্কারজনক ঘটনার নজির হয়ে থাকলো।

এর পরের উদাহরণ মন্টেগু-চেমসফোর্ড আইন, ১৯১৯। ১৯০৯ সালের মর্লি-মিন্টু সংস্কার আইনের মতোই এই আইনটিও ছিল সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে নির্বাচনের ব্যবস্থা। গান্ধীজী একে সমর্থন করলেন। অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দিয়ে হিন্দুদের ছেড়ে দেওয়া সরকারী চাকুরীতে মুসলিমদের প্রবেশের সুযোগ করে দিলেন। আর খিলাফৎ আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়ে অসংগঠিত মুসলিমদের সংগঠিত করার পথ সুগম করলেন।

লেখক দেখিয়েছেন হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের জন্য গান্ধী কোনওদিন কাজ করেননি। দেশদ্রোহিতার পুরস্কার হিসেবে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হয়েছে কংগ্রেসের হাতে। এটা তার মতে, তস্করের হাত থেকে দুষ্কৃতীদের হাতে। গান্ধীজীর মদতেই ভারত-বিভাগ হয়েছিল মুসলিম লীগের ভূমিকা ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনের। দ্বিচারিতার মূর্ত প্রতীক ছিলেম মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী।

২রা অক্টোবর থেকে শুরু হয়েছে গান্ধীজীর জয়গান। গান্ধীজী যে পরিবারের হাতে দেশকে সঁপে দিয়ে গেছেন, দুর্ভাগ্যজনক হলেও, দেশ এখনও তাদেরই হাতে শাসিত হচ্ছে। সুতরাং তাদেরই হাতে এখন সমস্ত প্রচার মাধ্যম এবং তাদের পোষ্য বুদ্ধিজীবী মহল। এরাই গান্ধীজীর কালো দিকগুলি চাপা দিয়ে মানুষের মনে ধোঁয়াশা সৃষ্টি করছে। এই সময়ে এই বইটি জনগণের হাতে গেলে তাঁরা গান্ধীজী সম্পর্কে এইরকম অনেক ধোঁয়াশা থেকে মুক্তি পাবেন বলে মনে হয়।

যে মহাত্ম সারাজীবন দ্বিচারিতা করে গেছেন। লেখক ঃ প্রিয়রঞ্জন কুণ্ডু। পি ৪৭ এল আই সি টাউনসিপ! মধ্যমগ্রাম। কলকাতা-১২৯। মূল্য ঃ ১০০ টাকা।

শঙ্করাচার্যের সাহিত্য সৃষ্টির কথা বর্তমান প্রজন্মের কাছে অন্ধকারেই থেকে গেল

সাধনানন্দ মিশ্র।। পৃথিবীতে যখন সনাতন ধর্মের মধ্যে গ্লানি প্রবেশ করে তখন সেই ধর্মকে গ্লানিমুক্ত করে তাকে সঠিক পথে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করার জন্য মানুষের আকৃতিতে মানুষের মধ্যেই হয় ভগবানের আবির্ভাব। এই পরম্পরাই ভারতে বহু প্রাচীনকাল থেকেই চলে আসছে।

এই পরম্পরা বা নিয়ম অনুসারে আজ থেকে প্রায় ১২০০ বছরেরও অধিক পূর্বে ভারতে আবির্ভূত হয়েছিলেন শিবের সাক্ষাৎ অবতারপুরুষ আদি শঙ্করাচার্য। শঙ্করাচার্যের আবির্ভাবের সময় ভারতে বেদশাসিত ধর্মব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়েছিল। প্রত্যেকে নিজের মতো করে বেদের ব্যাখ্যা করতে থাকলেন। এদিকে ভগবান বুদ্ধের সময়ে তিনি বেদের ভিত্তিতে উপাসনা করলেও বুদ্ধের নির্বাণলাভের (মোক্ষ) পর তাঁর মতাবলম্বী বৌদ্ধদের মধ্যে ব্যভিচার ও তান্ত্রিক, অধার্মিক ক্রিয়াকলাপ চলতে থাকায় বেদোক্ত সনাতন ধর্মের পথ থেকে ভ্রষ্ট হয়ে বেদের নিন্দায় পঞ্চ মুখ হলেন। একদিকে হিন্দুদের ধর্মের প্রবক্তাদের মধ্যে মত ও পথের বিরোধ, বেদের বিকৃত ব্যাখ্যা প্রচার, অন্যদিকে বৌদ্ধ ও জৈনধর্মের অনুসারীদের ব্যভিচার, শাক্ত তান্ত্রিক সাধকদের আভিচারিক ক্রিয়াদির ফলে মূল সনাতন ধর্মের কথা সকল হিন্দুই বিস্মৃত হয়েছিল। প্রচণ্ড ঐশী শক্তি নিয়ে শঙ্করাচার্য মাত্র ৩২ বছর জীবিতকালের মধ্যে সর্বশাস্ত্রজ্ঞ হয়ে যেভাবে সনাতন ধর্মের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ও তৎকালীন দেশের সমস্ত বিরোধী-মতের পণ্ডিতদের তর্কে পরাস্ত করে বেদের অদ্বৈতবাদ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তা অত্যন্ত বিস্ময়কর।

আলোচ্য 'শিবাবতার আচার্য শঙ্কর' নামক পুস্তকে শ্রীমৎ দেবানন্দ ব্রহ্মচারী সংক্ষেপে সেইসব বিবরণ লিপিবদ্ধ করে এক মহৎ কার্য সম্পাদন করেছেন। এই মহাজীবনের কথা নিয়ে অনেক পুস্তক প্রকাশিত হলেও আলোচ্য পুস্তকটিতে লেখক শঙ্করাচার্যের বাল্যশিক্ষা, মাতৃভক্তি, গুরু গোবিন্দপাদের আশ্রয়লাভ, যোগশিক্ষা ও অন্যান্য শাস্ত্রশিক্ষা, ১৬ বছর বয়সের মধ্যেই তাঁর ব্রহ্মসূত্র, গীতা ও উপনিষদের ভাষ্য প্রণয়ন, বহু শিষ্যের মধ্যে প্রধান চার শিষ্য-কে (হস্তামলকাচার্য, তোটকাচার্য, পদ্মপাদাচার্য, সুরেশ্বরাচার্য) ভালোভাবে প্রশিক্ষিত করে তাঁদের উপরেই বৈদিক ধর্ম প্রচারের দায়িত্ব দেওয়া, সারা ভারত ও ভারতের বাইরে শিষ্যগণসহ পরিব্রাজন করে তৎকালীন বড় বড় বৌদ্ধ, জৈন, শাক্ত ও অন্যান্য বিপথগামী ধর্মবিরোধী পণ্ডিতদের তর্কে পরাস্ত করে বৈদিক ধর্মের সঠিক পথ ও অদ্বৈতবাদের প্রতিষ্ঠা, বড় বড় তীর্থের সংস্কার, আচার্যের উপর তান্ত্রিক ও কাপালিকদের আভিচারিক ক্রিয়ার প্রয়োগ ও অলৌকিক প্রভাবে তাঁর জীবনরক্ষা, কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত তাঁর দিগ্বিজয় যাত্রা ইত্যাদি সবই আলোচ্য গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। হিন্দুদের সমস্ত সম্প্রদায়কে একসূত্রে বেঁধে রাখবার উদ্দেশ্যে ও মানুষের কল্যাণের জন্য পঞ্চ দেবতার পূজা (গণেশ, সূর্য, বিষ্ণু, শিব ও দুর্গা) ও পঞ্চ মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান

(দেবযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, হোমযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ বা বলিযজ্ঞ ও নৃযজ্ঞ) পুনঃপ্রবর্তন করেছিলেন।

লেখক তাঁর আলোচ্য গ্রন্থের শেষে শঙ্করাচার্যের অবদান ও দার্শনিক সিদ্ধান্ত সম্পর্কে মোটামুটি বিশদভাবে মূল্যবান্ আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন, শ্রীভগবান যেরূপ ষড়ৈশ্বর্যশালী, সেইরূপ গুণ ছিল শিবাবতার শঙ্করাচার্যের মধ্যে। ঐশ্বর্য, বীর্য, জ্ঞান, বৈরাগ্য, যশঃ ও শ্রী— এই ছয়টি ঐশ্বর্যে ভূষিত হয়ে তিনি অল্পসময়ের মধ্যে সনাতনধর্ম প্রতিষ্ঠার জন্য যে দুরূহ কাজ করে গেছেন, তা অত্যন্ত বিস্ময়কর। অবতারপুরুষের পক্ষেই তা সম্ভব। হিন্দুজাতির মধ্যে তিনি সমস্ত সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়কে দশটি ভাগে ভাগ করে (তীর্থ, আশ্রম, বন, অরণ্য, গিরি, পর্বত, সাগর, পুরী, সরস্বতী, ভারতী) দশনামী সম্প্রদায়ের প্রবর্তন করেছেন। ভারতবর্ষের চার প্রান্তে চার ধামে বদ্রীনাথ, দ্বারকা, জগন্নাথপুরী, শৃঙ্গেরী) চারটি মঠ স্থাপন করে প্রত্যেক ধর্ম ও তার পার্শ্ববর্তী প্রদেশের ধর্মীয় শাসনভার এক একটি দিক্পাল প্রধান শিষ্যের হাতে অর্পণ করেছেন। সনাতন ধর্মের মূল ভিত্তি প্রস্থানত্রয়— গীতা, ব্রহ্মসূত্র ও উপনিষদের ভাষ্য তৈরী করেছেন, যার দ্বারা হিন্দুসমাজ ঐক্যবন্ধনে আবদ্ধ থেকে এখনও অনুশাসিত হচ্ছে। ভাষ্যগ্রন্থকে হিন্দু জনসাধারণের কাছে বোধগম্য করার জন্য বহু প্রকরণগ্রন্থ বা সহায়ক গ্রন্থ সহজ সংস্কৃত ভাষায় রচনা করেছেন, লেখক শঙ্করাচার্য প্রণীত ১৩টি গ্রন্থের তালিকা দিয়েছেন।

আচার্য শঙ্কর অদ্বৈতবাদী হলেও হিন্দু দেবদেবীদের প্রতি তাঁর ভক্তিপূর্ণ নিষ্ঠার চিহ্নস্বরূপ লিখে গেছেন গণেশ, শিব, দুর্গা, বিষ্ণু, ভারতের প্রধান প্রধান নদীতীর্থ গঙ্গা ও নর্মদার সম্পর্কে বহু স্তোত্র অতি সুন্দর, সুললিত এবং কোমল ছন্দে। এ ছাড়াও চর্পটপঞ্জরিকা, মোহমুদগর, নির্বাণষট্‌ক, প্রভৃতি বহু স্তোত্র লিখে গেছেন। লেখক তাঁর আলোচ্য পুস্তকের শেষে শঙ্করাচার্যের 'মণিরত্নমালা' নামক বিখ্যাত কবিতা বা শ্লোকটি যোগ করে গ্রন্থের উপযোগিতা বহুগুণে বর্দ্ধিত করেছেন।

শঙ্করাচার্যের অপূর্ব সাহিত্য সৃষ্টির কথা আধুনিক তিনটি প্রজন্মের ছাত্র, যুবক-যুবতী ও প্রৌঢ়দের কাছে অন্ধকারেই থেকে গেল, তার সম্পর্কে এরা কিছুই জানতে পারলো না— এটা হিন্দুদের জাতীয় পাপ। সংস্কৃত

(এরপর ১৪ পাতায়)

কাদের স্বার্থে সরকার বিপুল পরিমাণ আলু হিমঘরে পচাচ্ছে?

এন. সি. দে

আলু চাষ সম্পর্কে বলতে গেলে প্রথমেই চলে আসে তার সমস্যার কথা। কারণ অন্যান্য অনেক ভারতীয় কৃষিপণ্য চাষের মতো এই চাষেও কেবল সমস্যা আর সমস্যা। এই চাষের কৃষিমূল্যও যে কিছু আছে সেটাও আমাদের ভুললে চলবে না। আলু কিন্তু দক্ষিণ আমেরিকাজাত তবে আজ তা আমাদের খাদ্য তালিকার অপরিহার্য অঙ্গে পরিণত হয়েছে। আর তাই আলু সবচেয়ে জনপ্রিয় সবজি। প্রধান খাদ্য তালিকায় এর স্থান চতুর্থ। এর আগে রয়েছে গম, চাল ও ভুট্টা। বিশ্বে আলু চাষে জমির পরিমাণের দিক দিয়েও ভারতের স্থান চতুর্থ আর উৎপাদনের দিক দিয়ে স্থান তৃতীয়। চীন ও রাশিয়ার পরেই। ভারতে আলু চাষে মোট জমির পরিমাণ সবচেয়ে বেশী ছিল ২০০৮— এ ১.৪৭ মিলিয়ন হেক্টর জমি। ওই বছর উৎপাদন ছুঁয়েছিল রেকর্ড ৩০ মিলিয়ন টনে (৩ কোটি টন), ফলে দাম অস্বাভাবিক হারে নেমে যাওয়ায় চাষীরা পড়েছিল মহাসঙ্কটে। অনেকে আত্মহত্যা করতেও বাধ্য হয়েছিল। ফলস্বরূপ পরের বছর থেকে চাষীরা অনেক কম জমিতে চাষ করে। ২০০৯-এ চাষের জমির পরিমাণ দাঁড়ায় ১.২ মিলিয়ন হেক্টরের কাছাকাছি।

বিশ্বে আলু উৎপাদনে যদিও ভারত রয়েছে তৃতীয় স্থানে, তবুও একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে ভারত কিন্তু ঐতিহাসিকভাবে এই চাষে বলতে গেলে নবীনই। ১৯৬০ সালেও এই চাষের পরিমাণ ছিল কেবলমাত্র ২,৪০০ মেট্রিক টন, সেখানে দক্ষিণ আমেরিকায় আলু চাষের ইতিহাস বহু প্রাচীন। ষোড়শ শতাব্দীতেও ইউরোপে আলু রপ্তানী করত তারা। তবে গত কয়েক দশকে এই চাষ বেশী ছড়িয়ে পড়েছে দক্ষিণ ও পূর্ব এশিয়াভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে। বিশ্বে আলু চাষে শীর্ষ দশটি দেশ হলো যথাক্রমে চীন, রাশিয়া, ভারত, আমেরিকা, ইউক্রেন, পোল্যান্ড, জার্মানি, বেলারুশ, নেদারল্যাণ্ড এবং ফ্রান্স। বিশ্বে আলু উৎপাদনে এই ১০টি দেশের অবদানই ৭০ শতাংশ। তবে ভারতের অবদানই নিতান্ত ৮ শতাংশ, মোট বিশ্ব উৎপাদনের পরিমাণ ৩২৭,৬২৪,৪১৭ মিলিয়ন টন (২০০৪ সালে)। ভারতের উৎপাদন ছিল মাত্র ২৫,০০০,০০০ মি. টন। এই পরিমাণ ২০০৮-এর পর থেকে অনেক কমে গেছে। সারা পৃথিবীতে বর্তমানে ১৫৫টি দেশে আলু চাষ হয়ে থাকে। তার মধ্যে মাত্র শ্রীলঙ্কা, সংযুক্ত আরব আমীরশাহী, মরিশাস, নেপাল, সিঙ্গাপুর, কুয়েত এবং জাপানে ভারত আলু রপ্তানী করে থাকে। আমেরিকা ও ইউরোপীয় দেশগুলো আজও তাদের বাজার ভারতকে ছেড়ে দেয়নি। ডব্লু টি ও-তে মুক্ত বাজার অর্থনীতির মার্কিনী বুলি শুধু এশিয়া-আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার গরীব দেশগুলোর জন্য। আমাদের মতো দেশগুলো তাদের বাজার শুল্কমুক্ত করে দেবে ওদের বাণিজ্যের সুবিধা করে দেবার জন্য, কিন্তু ওরা ওদের বাজার শুল্ক-মুক্ত করবে না। ধনী দেশগুলোর সঙ্গে সমস্ত দেশগুলিরই উচিৎ বাণিজ্য বন্ধ করে দেওয়া।

আলু চাষের আন্তর্জাতিক খ্যাতির সঙ্গে সঙ্গে জুটেছে এর একটি বিজ্ঞানসম্মত ল্যাটিন নাম, যা উদ্ভিদ বিজ্ঞানের অন্তর্গত হয়েছে। উদ্ভিদবিজ্ঞানীদের মতে, এটি

সোলানাসিয়া (Solanceae) পরিবারভুক্ত কন্দমূল জাতীয় শ্বেতসার পণ্য। বিশ্বের মানুষের গড় বাৎসরিক খাদ্য তালিকায় এই দশকে আলুর পরিমাণ ৩৩ কিলো। সারা বিশ্বে রয়েছে প্রায় ৫০০০ ধরনের আলু চাষ। এ ছাড়াও রয়েছে প্রায় ২০০ ধরনের বন্য আলু এবং আরও নানান অন্য-প্রজাতির আলু, এগুলির মিশ্রণ ঘটিয়ে আরও নতুন ধরনের আলু উৎপাদন সম্ভব।

আলুর পুষ্টিগুণও কিন্তু কম নয়। যদিও লোকে এর কার্বোহাইড্রেট গুণের কথাই বেশী জানে, তবে এতে রয়েছে এনার্জি, প্রোটিন, ভিটামিন সি, ক্যালসিয়াম, আয়রণ ম্যাগনেসিয়াম, ফসফরাস প্রভৃতি পুষ্টি। ফ্যাট (চর্বি) কিন্তু আছে একেবারে কম মাত্রায়। (০.১ গ্রাম প্রতি ১০০ গ্রামে)।

সারা দেশে আলু চাষ সারা বছরই প্রায় হয়ে থাকে। সেই কারণে কোথাও একে বলে রবি শস্য, কোথাও বা বলে খরিফ শস্য। রবি শস্য বোনা হয় অক্টোবরে আর ফলন তোলা হয় মার্চে। এই শস্য চাষ হয় মূলতঃ উত্তরপ্রদেশ, বিহার, পাঞ্জাব, পশ্চিমবঙ্গ, গুজরাট এবং অসমে। দেশের প্রায় ৮০ শতাংশ আলু উৎপাদন হয় এই ক'টি রাজ্যে রবি শস্য হিসাবে। আর বাদবাকি চাষ হয় খরিফ শস্য হিসেবে মহারাষ্ট্র, হিমাচল, জম্মু-কাশ্মীর ও উত্তরাখণ্ডে। খরিফ শস্য বোনা হয় গ্রীষ্মকালে জুলাই-আগস্টে আর তোলা হয় অক্টোবর-নভেম্বরে। এদের অবদান মাত্র ১২ শতাংশ।

আলু উৎপাদনে সারা বিশ্বে ভারতের স্থান তৃতীয় এবং জমির পরিমাণের দিক দিয়ে চতুর্থ, একথা আগেই বলা হয়েছে। ভারতে উৎপাদিত মোট আলুর ৮০ শতাংশই হয় উত্তরপ্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ এবং গুজরাটে। উত্তরপ্রদেশ রয়েছে প্রথম স্থানে, উৎপাদন ৩৯ শতাংশ; পশ্চিমবঙ্গ দ্বিতীয় স্থানে, উৎপাদন ৩৫ শতাংশ এবং গুজরাট তৃতীয় স্থানে, উৎপাদন ৬ শতাংশ। গুজরাট উৎপাদনে তৃতীয় স্থানে থাকলেও উৎপাদিকা শক্তি হিসাবে এই রাজ্যের স্থান কিন্তু সবার আগে। প্রতি হেক্টরে ২২.৬২ টন। পশ্চিমবঙ্গে উৎপাদন প্রতি হেক্টরে ২১.৬১ টন।

পশ্চিমবঙ্গে আলু উৎপাদন ২০০৮ সালে ছিল ৯.০ মিলিয়ন টন। ২০০৯ সালে এটিই হয়ে যায় ৫.৪ মিলিয়ন টন অর্থাৎ প্রায় ৪০ শতাংশ কম। কারণ আলু চাষীদের চাষে তীব্র অনীহা। এই কারণটিই হলো আলুচাষীদের সমস্যা। কি এই সমস্যা? এ এক বিপরীতধর্মী সমস্যা। এক দিকে বিশ্বের তুলনায় ভারতে উৎপাদন হয় মাত্র ৮ শতাংশ। ভারতের আলু উৎপাদনে পশ্চিমবঙ্গের অবদান আবার মাত্র এক-তৃতীয়াংশ। এদিকে আবার দেশের ভিতরে আলুর চাহিদাও আগের তুলনায় বাড়ছে। শুধু বাড়িতে বা হোটেলে আলু রান্নায় ব্যবহার নয়, দেশী-বিদেশী পুঁজিপতিরা আলু ভেজে সুদৃশ্য মোড়কে বিক্রির ব্যবসায়ে নেমেছে। অর্থাৎ যে আলু উৎপাদিত হচ্ছে তা অভ্যন্তরীণ বাজারেই বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। বহির্বাণিজ্যে আমাদের রাজ্যের আলু যেতে পারছে না।

কিন্তু পুঁজিবাদী বাজার অর্থনীতির প্রবক্তারা যে বলে থাকেন চাহিদা বাড়লে আর যোগান কম থাকলে জিনিসের দাম বাড়ে, তাহলে আমাদের আলু চাষীরা ভাল দাম পান না কেন? এইখানেই রহস্য। আসলে পুঁজিবাদী বাজার অর্থনীতিতে পুঁজিই প্রধান নির্ণায়ক। যার পুঁজি আছে যত, বাজারে তার প্রাধান্যই বেশি। আলু ওঠার সময় পুঁজিপতিরা প্রশাসনে পুঁজির প্রভাব খাটিয়ে আলুর দাম কমিয়ে রাখে। চাষী বাধ্য হয়ে নিতান্ত কম করে আলু বিক্রি দরে দিতে বাধ্য। পুঁজির প্রভাবে প্রশাসন তখন চোখ বুজে থাকে। তারা যখন ঘুম ভেঙ্গে আলু সহায়ক মূল্য দিয়ে কিনতে নামে, তখন বেশিরভাগ আলুই পুঁজিবাদী মহাজনী কারবারিরা গুদামজাত করে ফেলেছে।

২০১০-এ আলু হয় ৯০ লক্ষ ৫০ হাজার টন। অথচ সরকার কিনেছে মাত্র ৯ লক্ষ ৭৫ হাজার টন। আরও মজার ব্যাপার হলো যে, এই পুঁজির মহিমাতেই মোহিত হয়ে সরকার, আলুর মহাজনরা যখন আলু ১০-১৪ টাকা দরে আলু বিক্রি করতে শুরু করেছে, তখনও তারা গুদামজাত আলু ঠাণ্ডা ঘর থেকে বার করেননি। গত সেপ্টেম্বর থেকে রেশনে ৫ টাকা ৭৫ পয়সা দরে আলু বিক্রি করা হবে বলেও অক্টোবরে মহাজনদের অলিখিত চাপে তা বাড়িয়ে করে দেয় ৭ টাকা। সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসায়ীদের ৪ টাকা কেজি দরে বন্ড দেওয়ার কথা ঘোষণা করে দেয়। ফলে রেশন ডিলাররা ৭ টাকা দরে রেশনে আলু বিক্রি করতে চাননি। ৯ লক্ষ ৭৫ হাজার টনের মধ্যে মাত্র ১ লক্ষ ১০ টন সরকারী আলু হিমঘর থেকে বেরিয়েছে। বাদবাকি আলু কাদের স্বার্থে সরকার হিম ঘরে ধরে রেখেছে? নিঃসন্দেহে মহাজনী কারবারিদের স্বার্থে এই বিপুল পরিমাণ আলু সরকার হিমঘরে পচাচ্ছে। এটাই পুঁজিবাদী বাজার অর্থনীতি। এই অর্থনীতিতে একমাত্র সমস্যা 'সততার সমস্যা'। মন্ত্রী-আমলা-পুঁজিবাদী মহাজন সকলেই অসৎ। বেদান্ত দর্শন যে অর্থনীতির ভিত্তি নয়, সেই অর্থনীতিতে মানুষের মঙ্গল সম্ভব নয়। বেদান্তের শিক্ষা ঃ "তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা, মা গৃধঃ কস্যচিদ্‌ধনম্"। ত্যাগের মধ্যে ভোগ, পরের ধনের উপর লোভ না করা পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে অচল।

আলু-চাষী কল্যাণ মঞ্চের দাবী

আলুর সহায়ক মূল্য চাই

সংবাদদাতা॥ গত ১১ ডিসেম্বর মার্চেন্ট চেম্বার অফ কমার্সের সোস্যালি হলে আলুচাষী কল্যাণমঞ্চ ও স্বদেশী রিসার্চ ইনস্টিটিউট-এর যৌথ উদ্যোগে পশ্চিমবঙ্গের আলুচাষীদের জলন্ত সমস্যা বিষয়ে এক গোলটেবিল বৈঠকের আয়োজন করা হয়। এই আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ করেন স্বদেশী রিসার্চ ইনস্টিটিউটের নির্দেশক ডঃ ধনপদরাম আগরওয়াল, রাজ্য বিজেপি-র সভাপতি রাহুল সিনহা, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য অধ্যাপক সুজিত বসু, বিধানচন্দ্র কৃষি বিদ্যালয়ের অধ্যাপক অমিতাভ কোনার, আলুচাষী কল্যাণমঞ্চের সংযোজক ও স্বদেশী জাগরণ মঞ্চের পশ্চিমবঙ্গের সহ-সংযোজক সুব্রত মণ্ডল, ভারতীয় কিষাণ সঙ্ঘের পশ্চিমবঙ্গের সহ-সংগঠন সম্পাদক অমল কুমার ঘোষ প্রমুখ।

বিভিন্ন জেলা থেকে সভায় আগত আলুচাষীরা বলেন যে, প্রতি বিঘাতে আলুচাষ করতে গিয়ে খরচ পড়ে ১৩ থেকে ১৪ হাজার টাকা অথচ আলু বিক্রি(করতে হয় ৬-৭ হাজার টাকা। মাঠ থেকে কৃষক ১.৪০ টাকা কেজি দরে আলু বিক্রি(করে। অথচ বাজারে ব্যবসায়ীরা ইচ্ছামতো দামে বিক্রি(করে। এই আলোচনা সভায় আলুচাষী কল্যাণ মঞ্চ থেকে দাবী তোলা হয় যে আলু ভারতবর্ষে তিন নম্বর খাদ্যবস্তু— ধান ও গমের পরই। ধান, গমের সরকার সহায়কমূল্য করেছে, তাই তিন নম্বর খাদ্যশস্য হিসাবে আলুরও সহায়কমূল্য চাই। তাই আলুর সর্বনিম্ন সাবেক মূল্য ছয় টাকা করতে হবে। সরকারী বাজার ব্যবস্থার মাধ্যমে আলু কেনার ব্যবস্থা করতে হবে। আলুচাষীদের সচিত্র পরিচয় পত্র দিতে হবে। এই দাবীর প্রতি সরকার যদি মনোযোগ না দেয় তবে কৃষকরা আগামীদিনে তীব্র আন্দোলন গড়ে তুলবেন।

(বাঁ দিক থেকে) রাহুল সিন্‌হা, ধনপতরাম আগরওয়াল, সুজিত বসুও সুব্রত মণ্ডল।

বিজেপি-র মহাকরণ অবরোধ

গণতান্ত্রিক দেশে প্রত্যেক রাজনৈতিক দলের জনসাধারণের ও দেশের সমস্যা নিয়ে আন্দোলন সংবিধান স্বীকৃত। এখানে আইনসভায় সেই দলের প্রতিনিধিত্ব থাকা বা না-থাকার প্রশ্ন আসে না। আন্দোলনের মধ্য দিয়েই সেই দলের প্রতি, তাদের কর্মসূচীর প্রতি জনসমর্থন ফিরে আসে। বিশ্বের প্রতিটি গণতান্ত্রিক দেশে আমরা এই প্রবণতা দেখে থাকি। গত ৩০ নভেম্বর, ২০১০ কলকাতায় পশ্চিমবঙ্গ বিজেপি-র তরুণ নেতৃত্বের 'মহাকরণ অবরোধ' সেই গণতান্ত্রিক ভাবনা-চিন্তা, অভিযানের একটি উজ্জ্বল ও আশাপ্রদ দৃষ্টান্ত। নবীন নেতা, কর্মীরা কয়েক মাস ধরে অসংখ্য সভা, সমিতি করে, বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমের সাহায্যে এই বড় আন্দোলন সংগঠিত করে।

আন্দোলনকে কেন্দ্র করে কিছু দুঃখজনক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সংবাদপত্রের বিবরণ আজ আমাদের আলোচ্য বিষয়। বিভিন্ন কাগজে ওইদিনকার আন্দোলনের খবর পড়ে প্রথমেই মনে হয়েছে যে-দল দেশের ভাবনা-চিন্তা, সংস্কৃতির আলোয় উদ্দীপ্ত, তাদের একটি আন্দোলনকে কেন্দ্র করে এভাবে নিম্নরুচির ও উস্কানিমূলক প্রতিবেদন কি প্রকাশ করা যেত? এই অবরোধ-অভিযানের অধিকাংশ সংবাদপত্রের খবরকে 'বিকৃত' বললে অন্যায় ও অসংগত হবে, একথা অভিজ্ঞ মানুষজনেরা মনে করেন না। অবরোধের শেষ পর্যায়ের ঘটনাগুলো নিশ্চিতভাবেই অবাঞ্ছনীয় ও কাম্য ছিল না। কিন্তু সেখানে একটু অনুসন্ধিৎসু চিন্তা-ভাবনা থাকতে নেই? বিভিন্ন কাগজের সাংবাদিক-বন্ধুদের সেদিনের ঘটনার প্রকাশিত বিবরণ পড়ে আগ্রহী পাঠকেরা হতাশই হয়েছে।

এখন একটা প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই আসে ঃ সরকার পরিচালনার মূল কেন্দ্রকে এ-ভাবে অচল করে দেওয়া কতটা ন্যায়সঙ্গত? বিষয়টি নিয়ে নিশ্চিত সুস্থ মত বিনিময় হতে পারে। কিন্তু অতীতে দেখা গেছে অন্যান্য দল ও সংগঠনও এই ধরনের অভিযান করেছে। বেদনাদায়ক ঘটনাও ঘটেছে। মূল্যবান জীবন চলে গেছে! যতদূর মনে পড়ে সেদিন সাংবাদিক বন্ধুরা এই ধরনের আন্দোলনের বিরুদ্ধে সেভাবে সোচ্চার হননি! বিরুদ্ধ পক্ষকেই ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে সমর্থন করে গেছেন! কিন্তু বিজেপি-র বেলায় চিত্রটি একটু পালটে গেছে সাংবাদিক বন্ধুদের কাছে। বন্ধুরা এই অভিযানের সাহিত্য-রস-রঞ্জিত বিবরণ পরিবেশন করেছেন। যুৎসই 'বিশেষণ' ও বিশেষ্য' লাগিয়ে আন্দোলনের নিন্দা করেছেন। সব কিছু দেখে-শুনে ও বিশ্লেষণ করে অভিজ্ঞজনেদের মনে হয়েছে সাংবাদিক বন্ধুরা বর্তমানে একটি লক্ষ্য নিয়েই চলছেন। সেটা হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে বিজেপিকে প্রতিষ্ঠিত হতে না-দেওয়া? বন্ধুদের অভিপ্রায় শেষপর্যন্ত পূরণ হবে তো? আগামীদিনে যদি অন্য কিছু পরিবর্তন' হয়, সেই 'পরিবর্তনকে' মেনে নেওয়ার সৎ সাহস দেখার আশায় রইলুম।

—রণজিৎ সিংহ, কলকাতা-৭০০০৩৬।

বামফ্রন্ট ও ভেদনীতি

সিসিএমের মুসলিম প্রেম এবার রেকর্ড সৃষ্টি করেছে। নাস্তিক কমিউনিস্ট মতাদর্শে ঈশ্বর বা আল্লা নিয়ে ভাবাবেগের স্থান নেই। ২০১১ সনের নির্বাচনে হতাশায় আচ্ছন্ন বামপন্থীরা আত্মরক্ষার জন্য আল্লার শরণাগত। তাই সরকারী তহবিল থেকে বামফ্রন্ট-সরকার উন্নয়নের নামে কোটি কোটি টাকা ব্যয় করছেন মাদ্রাসা শিক্ষার প্রচার প্রসার এবং মুসলিম এলাকার উন্নয়নের জন্য। হজযাত্রীদের নিয়ে সিপিএম তৃণমূল কংগ্রেসের নানারকম উন্নয়ন অভিনয়ের পরে, এখন বিধানসভা নির্বাচনে মুসলমান সমাজের ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মাদ্রাসা নিয়ে চলছে প্রচার অভিযান। ১৯৭৭-৭৮ সনে পশ্চিমবঙ্গে মাদ্রাসার সংখ্যা ছিল ২৩৪ টি। বামফ্রন্ট-ক্ষমতায় আসার পরে সেই সংখ্যা এখন ১৪৮১ টি। আরও তিনশত নতুন মাদ্রাসা নির্মাণের উদ্যোগ হচ্ছে। এইসব কর্মসূচি পালন করতে গিয়ে অন্য কোনও সম্প্রদায়ের মানুষের ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দিকে তাকাবার মতো সময় নেই। মাদ্রাসা শিক্ষার প্রচার প্রসার কর্মসূচীর অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে আরও আছে যেমন, মাদ্রাসার ছাত্রছাত্রীদের এই কেনার জন্য মাথাপিছু ২৫০ টাকা করে দিচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। অষ্টম শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত সমস্ত ছাত্রীদের প্রতি মাসে ১০০ টাকা করে উৎসাহ ভাতা এবং অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত দরিদ্র ছাত্রীদের জন্য সরকার দিচ্ছেন বিনামূল্যে পোশাক। এ ছাড়াও মুসলিম ছাত্রছাত্রীদের বামফ্রন্ট সরকার জলপানি দিচ্ছে গত তিন বছর ধরে ১৫০ টাকা করে। এখন বিভিন্ন বিজ্ঞাপন ও প্রচার মাধ্যমের সহযোগিতায় বামফ্রন্ট সরকার মুসলিম ভোটব্যাঙ্ক অটুট রাখার জন্য আরও নানারকম উন্নয়নের কর্মসূচী মুসলিম এলাকাগুলিতে প্রচার করে চলছে।

এর ফলে অমুসলিম এলাকায় কোনও বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হবে কিনা, তা নিয়ে চিন্তা ভাবনা করার সময় নেই বামফ্রন্টের রথী-মহারথীদের। এ বিষয় নিয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে কয়েকজন সিপিএম নেতার মন্তব্য, অমুসলিম সমাজ এসব নিয়ে মাথা ঘামায় না। অন্যদিকে মুসলিমরাও বামফ্রন্টের এই সব নির্বাচনী কূট-কৌশল তেমন একটা ভাল চোখে দেখছেন না। তাদের সামাজিক উন্নয়নে সরকার ছাড়াও আছে দেশীয় এবং মহাদেশীয় অর্থ ভাণ্ডার;যা শুধু মাত্র মুসলমান সমাজের উন্নয়নের কাজে ব্যবহৃত হয়। কাজেই তাদের প্রতি বামফ্রন্ট সরকারের 'অনুন্নত, অনগ্রসর সংখ্যালঘু' শব্দগুলোর ব্যবহার মর্যাদাহানিকর। বামফ্রন্ট সরকারের চিন্তা করা উচিত, ভারতবর্ষ সাতশত বৎসর ছিল মুসলিম সরকারের শাসনাধীন। এখনও ভারতের দুটো অংশে চলছে স্বাধীন মুসলমান রাষ্ট্র।

যাইহোক, আগামী বিধানসভা নির্বাচন এমনি নানারকম বিতর্কের অবসান ঘটাবে বলেই মনে হয়।

—শ্যামাপ্রসাদ দাস, অশোকনগর, উত্তর ২৪ পরগণা।

এক রাজনৈতিক ঠগবাজি

বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে ও প্রত্যক্ষভাবে জেনেছি কি বাংলাদেশে, কি পশ্চিমবঙ্গে তথা ভারতে অনেক বছর থেকে প্রধানত দু'টি চিৎকার উঠছে। এক—'আমার ভোট আমি দেব, যাকে খুশী তাকে দেব'। দুই—'অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন চাই'। এসব দাবি জনগণের হয়ে কিছু রাজনৈতিক দলের, যারা বিরোধী দলে থাকে। এ দাবিগুলোর অন্তত প্রথমটি বস্তুত জনগণের অজ্ঞতার সুযোগে রাজনৈতিক ধোঁকাবাজি। যদিও তা বাহ্যত গণতান্ত্রিক।

গণতন্ত্রের মূলকথা 'জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত, জনগণের জন্য, জনগণের সরকার।' নিঃসন্দেহে শুনতে খুবই ভাল কথা, কিন্তু আমাদের দেশে ওই কথাটার তিনটি অংশের প্রথম অংশটা (জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত) ছাড়া বাকী দু'টি অংশ বাস্তবিকই মূল্যহীন। যদিও ওই প্রথম অংশটাও সর্বাংশে সত্য নয়। গণতন্ত্র নিয়ে উপরোক্ত সিদ্ধান্তের কারণসমূহ ব্যাখ্যা করা যাক—গণতন্ত্রের প্রথমপক্ষ রাজনৈতিক দল ও দলের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিবর্গ ঃ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সরকার গঠন করার জন্য রাজনীতির চর্চা করে বিভিন্ন নামের কতকগুলো দল। ওই দলগুলোর পরিচালকগণ প্রধানত পেশাদার রাজনীতিক। তাঁরা প্রায় সকলেই স্বার্থান্বেষী ও মতলববাজ, অন্তত ইদানীং আমাদের দেশে।

চিঠিপত্র

গণতন্ত্রের দ্বিতীয়পক্ষ—জনগণ। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নির্বাচনের অধিকার জনগণের। তারা ভোট দেয় কিন্তু জনগণ বলতে যাদের বোঝায় তাদের অধিকাংশেরই রাজনৈতিক কাণ্ডজ্ঞান থাকে না। বিশেষত আমাদের দেশে, যেখানে বেশীরভাগ লোক অশিক্ষিত বা অজ্ঞ। তারা যাদেরকে ভোট দিয়ে নির্বাচিত করে তাঁদের সম্পর্কে ভাল করে কিছুই জানে না। জানার উপায়ও নেই। কেবল প্রচার শুনে, চাপের মুখে, গড্ডালিকা প্রবাহে কিংবা অন্য কোনও কারণে ভোট দেয়, যাতে বোধ ও বিচক্ষণতার বা স্বাধীন মতামতের পরিচয় অনেক ক্ষেত্রেই পাওয়া যায় না। আর শিক্ষিত বলতে যাদের বোঝায় তাদের অনেকেও এই শ্রেণীভুক্ত। সুতরাং ওই যে চিৎকার—'আমার ভোট আমি দেব, যাকে খুশী তাকে দেব' সেটা তেমন অর্থবহ হয় না। আর দ্বিতীয় চিৎকারটা—'অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন চাই' যে প্রায়ই হয় না সেকথা কে না জানে? তবে তর্কের খাতিরে ধরে নেওয়া যাক অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন হলো। তাতে গণতন্ত্রের যে মূল্য লক্ষ্য, সৎ প্রতিনিধি নির্বাচন করে দেশের সুখশান্তি ও ন্যায় বিচার নিশ্চিত করা তা কি হবে? হচ্ছে না, হবেও না। কেন হচ্ছে না তার কিছু কারণ উপরেই বর্ণিত।

পৃথিবীতে রাষ্ট্র পরিচালনায় এ পর্যন্ত ক্রমান্বয়ে সামন্ততন্ত্র, রাজতন্ত্র, একনায়কতন্ত্র, পুঁজিবাদ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ইত্যাদি যত মতবাদই এসেছে তা মানুষের দ্বারাই উদ্ভাবিত। এবং মানুষই তা পরিচালনা করে। দেখা গেছে, মতবাদটা যত ভালই হোক তার রূপকার মানুষ বা দলীয় নেতা-কর্মীরা যদি সৎ, উপযুক্ত ও একনিষ্ঠ না হ'ন তবে তার দ্বারা কোনও সুফল আশা করা যায় না। ইতিহাস এই সত্যটাকে বার বার প্রমাণ করেছে। অপরপক্ষে দেখা গেছে, রাজতন্ত্র বা একনায়কতন্ত্র, যাকে আমরা খারাপ বলে জানি তা-ও যদি দেশের কল্যাণ নিশ্চিত করে, যদি সেই রাজা বা একনায়ক সর্বতোভাবে মহান ও উপযুক্ত হ'ন দেশের প্রজাদের কল্যাণে নিষ্ঠাবান হ'ন তবে তা কি কাম্য নয়? তন্ত্রটা তো পথ। লক্ষ্যটা হচ্ছে কল্যাণ। মূল কথা হচ্ছে, জনগণের নৈতিক চেতনা জাগ্রত করা, তাদের শিক্ষিত করে প্রকৃত মানুষ করা এবং সেজন্য চাই বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার অর্থবহ পরিবর্তন। তবেই মুষ্টিমেয় মতলববাজ, দুর্নীতিপরায়ণ, স্বার্থান্বেষী রাজনৈতিক নেতা-কর্মী ও তাদের ধান্দাবাজ মদতদাতাদের খপ্পর থেকে মুক্ত হওয়ার পথ খুঁজে পাব।

—কমলাকান্ত বণিক, দত্তপুকুর, উত্তর ২৪ পরগণা।

কার সাধ্য রোধে বামফ্রন্টের উন্নয়ন!

শুভব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়

গত ২৭ নভেম্বর '১০ শনিবার বসিরহাটে এক জনসভায় পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন— "কত কাজ বামফ্রন্ট সরকার গত ৩৪ বছরে করতে পেরেছে তা যেমন জানা আছে, তেমনই এটাও জানা আছে কত কাজ বাকী আছে।" অতীব সত্য। যে সব কাজ বামফ্রন্ট সরকার গত ৩৪ বছরে করতে পেরেছে, তার সামান্য কিছু উল্লেখ করা মনে হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

(১) স্বাধীনতার পর এবং কংগ্রেসী জমানায় পশ্চিমবঙ্গ শিল্পে সারা ভারতে প্রথমস্থানে ছিল। গত ৩৪ বছরের বাম জমানায় পশ্চিমবঙ্গ শিল্পে প্রথম স্থান থেকে ত্রয়োদশ স্থানে নেমে এসেছে। (২) শিক্ষায় পশ্চিমবঙ্গ সারা ভারতের মধ্যে দ্বিতীয় স্থানে ছিল। ৩৪ বছরের বামশাসনে পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষায় নেমে এসেছে সপ্তদশ স্থানে। (৩) এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে নথিভুক্ত বেকারের সংখ্যা ৭৫ লক্ষেরও বেশী। ভারতের শেফিল্ড নামে খ্যাত হাওড়া শিল্পাঞ্চল শ্মশানে পরিণত হয়েছে। জি টি রোড আর ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চল মৃত। ভারতে রূঢ় অঞ্চল নামে খ্যাত দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চল ধুঁকছে, মরণদশা উপস্থিত। হুগলী নদীর তীববর্তী জুট মিলগুলি সব লাটে উঠেছে। কিন্তু কারণ কি? কমরেডদের ক্রমাগত "ভেঙ্গে দাও গুঁড়িয়ে দাও, চলছে না চলবে না, ধোঁয়াবন্ধ চাক্কা বন্ধ" প্রভৃতি শ্লোগানে অতিষ্ঠ হয়ে শিল্পপতিরা পশ্চিমবঙ্গ ত্যাগ করেছে। সত্তর-এর দশকে পশ্চিমবঙ্গে কম্পিউটার চালু করতে দেয়নি বামেরা। এখন বলছে ভুল হয়ে গেছে।

শিক্ষায় প্রাথমিক স্তর থেকে ইংরেজী তুলে দিয়ে পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষার সর্বনাশ করেছে এই বামেরাই। উচ্চশিক্ষার জন্য পশ্চিমবঙ্গ থেকে ছাত্র-ছাত্রীরা দলে দলে ব্যাঙ্গালোর, পুণে প্রভৃতি স্থানে যেতে আরম্ভ করল। সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় পশ্চিমবঙ্গের পরীক্ষার্থীরা ক্রমাগত অকৃতকার্য হতে শুরু করল। এই বামেরা মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক স্নাতক প্রভৃতি পাঠ্য বিষয় নিয়ে নানারকম পরীক্ষা নিরীক্ষা শুরু করল, স্কুলে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পাশ ফেল উঠিয়ে দিয়ে শিক্ষার বারোটা বাজিয়ে ছাড়ল। অবশ্য অনস্বীকার্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার গত ৩০ বছরে মাদ্রাসা শিক্ষা খাতে খরচ বাড়িয়েছে ২৩০০ গুণেরও বেশী। ১৯৭৭ সালে, মাদ্রাসা শিক্ষক এবং শিক্ষাকর্মীদের সংখ্যা ছিল ২৮১৩, আর বর্তমানে সেটা হয়েছে ৯৫০০-র মতো। হাই মাদ্রাসার ছাত্র সংখ্যাও ওই সময়ের মধ্যে ৩৪৩৩ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৪১০০০ (অননুমোদিত মাদ্রাসা হিসাব বহির্ভূত) ১৯৭৭-এর পূর্ববর্তী সময়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকার মাদ্রাসা শিক্ষকদের এবং শিক্ষাকর্মীদের ব্যয়ভার বহন করত না। কিন্তু তারপর থেকে সরকারি বিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং শিক্ষাকর্মীদের সমহারে মাদ্রাসা শিক্ষক এবং শিক্ষাকর্মীদের বেতন, ভাতা এবং পেন্‌শন রাজ্য সরকার বহন করে আসছে। কিন্তু এত করেও মিঞা সাহেবদের হৃদয় জয় করা যাচ্ছেনা। তারা মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে বামফ্রন্ট থেকে।

জনমত

এবার কৃষি প্রসঙ্গে আসা যাক। বাম জমানায় গত ৩০ বছরে দেশের খাদ্যশস্য উৎপাদনে পশ্চিমবঙ্গের অবদান, ৬.৪ শতাংশ থেকে বেড়ে হয়েছে ৭ শতাংশ। প্রশ্ন হলো— এটা কি অসাধারণ অগ্রগতির নিদর্শন? পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ২০০৪-০৫-এর আর্থিক সমীক্ষায় দেখা যায় পশ্চিমবঙ্গে যেখানে ১ হেক্টর জমিতে চাল হয় ২৪৬৩ কিলো, সেখানে তামিলনাড়ুতে তার ফলন ৩৩৫০ কিলো, হরিয়ানায় ২৭২৪ কিলো, অন্ধ্রপ্রদেশে ২৬২১ কিলো এবং পাঞ্জাবে ৩৫১০ কিলো। হেক্টর পিছু গম ফলনে পশ্চিমবঙ্গে ২৩১৫ কিলো জাতীয় গড় ২৭০৭ কিলো, তৈলবীজ বাংলায় ৯৫১ কিলো জাতীয় গড় ১০৭২। ডাল উৎপাদনে পশ্চিমবঙ্গে ৮৪০ কিলো, জাতীয় গড় ৬২৩। ২০০৩-০৪-এ ভারতে খাদ্যশস্যের মোট উৎপাদন হয়েছিল ২১২০ লক্ষ টন যার মধ্যে উত্তরপ্রদেশের ৪৪২ লক্ষ (দেশের ২০.৮৩ শতাংশ) পাঞ্জাবের ২৪৭ লক্ষ (১১.৬৩ শতাংশ) রাজস্থানের ১৮০ লক্ষ (৮.৫১ শতাংশ) আর বাংলার ফলন ১৪৭ লক্ষ টন যা জাতীয় উৎপাদনের ৭ শতাংশ মাত্র। তবে পাট এখন বোঝা বিশেষ। ১৯৫৫ সালের অত্যাবশ্যক পণ্য আইনে এবং Jute (Licensing and control) order of 1961-এ পাটের সর্বনিম্ন দাম তাই বেঁধে দিতে হয়েছে।

বামফ্রন্ট সরকারের ঢক্কা নিনাদে আমরা জেনেছি মৎস্য উৎসাদনে পশ্চিমবঙ্গ প্রথম। অন্ধ্রপ্রদেশ, ওড়িশা প্রভৃতি রাজ্য থেকে প্রতিদিন মাছ আমদানি না হলে বাঙ্গালীকে মাছ খাওয়া বন্ধ করে দিতে হোত। 'মছলি খোর বাঙ্গালী' বদনামটা ঘুচে যেত। তবে, উন্নয়ন যে কিছুই হয়নি এটা বলা অপপ্রচার মাত্র। উন্নতি অবশ্যই হয়েছে। কমরেডদের উন্নতি হয়েছে, পার্টি ক্যাডারদের উন্নতি হয়েছে। এক সময় কুর্পাস ক্যাম্প, ধুবুলিয়া ক্যাম্প প্রভৃতি উদ্বাস্তু শিবিরে যারা বাস করতেন তাদের অনেকে মন্ত্রী হয়েছেন, সাংসদ হয়েছেন, বিধায়ক হয়েছেন। অনেকেই কোটিপতি হয়েছেন; এক সময় যাদের সাইকেল ছিল না তারা এখন বিলাসবহুল গাড়ী চাপছেন। টালির ঘরে যারা বাস করতেন তাদের অনেকে এখন প্রাসাদোপম অট্টালিকাতে বাস করছেন। পদমর্যাদায় (যোগ্যতা না থাকলেও) বিভিন্ন সংস্থার চেয়ারম্যান হচ্ছেন ডাইরেক্টর হচ্ছেন নিজেদের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় স্বজনদের চাকরী, পারমিট, লাইসেন্স প্রভৃতির ব্যবস্থা হয়ে যাচ্ছে। আমলাশোলে অনাহারে মৃত্যু বা উত্তরবঙ্গে বন্ধ চা-বাগান ও কারখানার শ্রমিকদের অনাহারে মৃত্যুর ঘটনা বা সিঙ্গুরে তাপসী মালিককে জীবন্ত পুড়িয়ে মারার মতো ঘটনা ঘটতেই পারে। তারজন্য উন্নয়নকে স্তব্ধ করার ঘৃণ্য অপচেষ্টা অবশ্যই বরদাস্ত করা হবে না। ফ্রন্টকে এগোতে কেউ বাধা দিলে চুরমার করে দেওয়া হবে। যথার্থই বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী। "কার সাধ্য রোধে ফ্রন্টের গতি?"

ঠাকুরের পদচিহ্ন

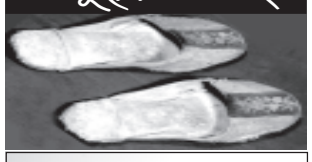

কাশীপুর উদ্যানবাটী

হাটে হাঁড়ি ভেঙে দিলেন প্রাণের ঠাকুর

অর্ণব নাগ

মহাপুরুষ কিংবা অবতারের রোগাক্রান্ত হওয়া আদৌ সম্ভবপর কিনা কিংবা রোগাক্রান্ত হলে তাঁকে মহাপুরুষের তকমা দেওয়া কতটা যুক্তিযুক্ত— এনিয়ে আবহমানকাল থেকেই বঙ্গমানসে একটা কুটিল জিজ্ঞাসা প্রতীয়মান হয়েছিল। রাজা রামমোহন সৃষ্ট ধর্ম-আন্দোলন তখন ঠাকুর বাড়ির (দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর) আঙিনা পেরিয়ে কলুটোলার সেন বাড়ির রামকমল সেনের পৌত্র কেশবচন্দ্রের নিশ্চিন্ত ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করেছে। যার ফলে রেনেসাঁর সবটুকু আলোয় সমাজ উদ্ভাসিত। তাঁর এই ধর্মান্দোলনে কেশবচন্দ্র যাঁর থেকে 'ধর্মে'র প্রেরণা পাচ্ছেন, তিনি দক্ষিণেশ্বরের ছোট ভট্চায, উত্তরকালের শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণঠাকুর। কাহারা বহিরঙ্গ তাহা এই সময়ে (তাঁর শারীরিক অসুস্থতার সময়ে) নিরূপিত হইবে।" কাশীপুর উদ্যানবাটী অবস্থানকালে ঠাকুরের লীলাকালের স্থায়িত্ব মোটে মাস আষ্টেকের (১১ ডিসেম্বর, ১৮৮৫ থেকে ১৫ আগস্ট, ১৮৮৬)। এরই মধ্যে তিনি চিনে নিয়ে কৃপা করেছেন অন্তরঙ্গ ভক্তদের। তাদের আবার দু'টি ভাগ, একদল গৃহী, অপরদল গৃহত্যাগী। ত্যাগের হোমকুণ্ড প্রজ্জ্বলিত এই কাশীপুর উদ্যানবাটীতেই। নেতা নরেন্দ্রনাথ (উত্তরকালের স্বামী বিবেকানন্দ)। 'শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ'-রচনাকার শরৎ মহারাজের লেখনী-তে, "...যুবক ভক্তরা সকলেই এখানে (অর্থাৎ কাশীপুর উদ্যানবাটীতে) একে একে উপস্থিত হইল। ঠাকুরের সেবাকাল ভিন্ন অন্য সময় নরেন্দ্র তাহাদিগকে ধ্যান, ভজন, পাঠ, সদালাপ, শাস্ত্রচর্চা ইত্যাদিতে এমনভাবে নিযুক্ত রাখিতে লাগিলেন যে, পরম আনন্দে কোথা দিয়া দিনের পর দিন যাইতে লাগিল তাহা তাঁহাদিগের বোধগম্য হইতে লাগিল না। একদিকে ঠাকুরের শুদ্ধ নিঃস্বার্থ ভালবাসার প্রবল আকর্ষণ, অন্যদিকে নরেন্দ্রনাথের অপূর্ব সখ্যভাব ও উন্নত সঙ্গ একত্র মিলিত হইয়া তাহাদিগকে ললিত-কর্কশ এমন এক মধুর বন্ধনে আবদ্ধ করিল যে, এক পরিবার-মধ্যগত ব্যক্তিসকল অপেক্ষাও তাহারা পরস্পরকে আপনার বলিয়া সত্যসত্য জ্ঞান করিতে লাগিল। সুতরাং নিতান্ত আবশ্যক কেহ কোনওদিন বাটীতে ফিরিলেও ওইদিন সন্ধ্যায় অথবা পরদিন প্রাতে তাহার এখানে আসা এককালে অনিবার্য হইয়া উঠিল।

কল্পতরু -এই গাছের তলায় (রেলিং দিয়ে ঘেরা) গিরীশ ঘোষ, রামচন্দ্র দত্ত প্রমুখকে 'তোমাদের চৈতন্য হোক' বলে কৃপা বিতরণ করেছিলেন ঠাকুর। ছবি ঃ শিবু ঘোষ

কেশবচন্দ্রের 'পরমহংস'। ইনি সূর্যালোকের মতোই উদিত হবেন রেনেসাঁর ক্যানভাসে। তাঁর মধ্যেই চিনিয়ে দেবেন নিজের স্বরূপ। অকুস্থল— কাশীপুর উদ্যানবাটী।

ঠাকুরের শেষ লীলাস্থল এই কাশীপুর উদ্যানবাটী। এখানে ঠাকুরের অবস্থানকাল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কারণ রেনেসাঁর যে দ্যুতি উনিশ শতকের সমাজ দেখে এসেছে তার উৎস সন্ধানের সময়টা আচমকাই এসে পড়েছে শতাব্দীর প্রায় অন্তিমলগ্নে। ঠাকুর তখন কণ্ঠরোগে আক্রান্ত। গলার ব্যথায় মাঝে-মধ্যেই অধৈর্য হয়ে পড়ছেন। অসংখ্য মানুষ তাঁকে দেখেছে, তবে বুঝতে পারেনি। তাই ঠাকুর বলছেন, 'যাইবার আগে হাটে হাঁড়ি ভাঙ্গিয়া দিব'। সময় হয়েছে মানবলীলা সংবরণ করার। তার আগে দরকার হাটে হাঁড়ি ভেঙে দিয়ে জগৎকে নিজের স্বরূপ চিনিয়ে দেওয়ার। ঠাকুর আরও বলেছেন, "(ভক্তগণের মধ্যে) কাহারা অন্তরঙ্গ ও ঐরূপে শেষ পর্যন্ত এখানে থাকিয়া তাহারা সংসারত্যাগে সেবাব্রতের উদযাপন করিয়াছিল। সংখ্যায় তাঁহারা দ্বাদশ জনের অধিক না হইলেও প্রত্যেকে গুরুগতপ্রাণ ও অসামান্য কর্মকুশল ছিল।"

ঠাকুরের এই দ্বাদশ ত্যাগী সন্তানেরা হলেন— নরেন্দ্রনাথ দত্ত (স্বামী বিবেকানন্দ), রাখালচন্দ্র ঘোষ (স্বামী ব্রহ্মানন্দ), বাবুরাম ঘোষ (স্বামী প্রেমানন্দ), নিত্যনিরঞ্জন ঘোষ (স্বামী নিরঞ্জনানন্দ), যোগীন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী (স্বামী যোগানন্দ), রাখতু রাম (লাটু মহারাজ বা স্বামী অদ্ভুতানন্দ), তারকনাথ ঘোষাল (স্বামী শিবানন্দ), গোপালচন্দ্র ঘোষ (বুড়ো গোপাল বা স্বামী অদ্বৈতানন্দ। যুবক ভক্তদের মধ্যে ইনিই একমাত্র বৃদ্ধ ছিলেন।), কালীপ্রসাদ চন্দ্র (স্বামী অভেদানন্দ), শশীভূষণ চক্রবর্তী (স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ), শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী (স্বামী সারদানন্দ) এবং হুটকো গোপাল। এরা ছাড়াও আসতেন আরও কয়েকজন অসাধারণ ত্যাগী যুবক। এঁদেরই একজন সারদাপ্রসন্ন মিত্র (উত্তরকালের স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ)। ইনি বাবার বকাবকির কারণে মাত্র দু'একদিন এসে থাকতে পারতেন উদ্যানবাটীতে। এছাড়াও আসতেন হরিনাথ চট্টোপাধ্যায় (স্বামী তুরিয়ানন্দ), গঙ্গাধর গঙ্গোপাধ্যায় (স্বামী অখণ্ডানন্দ), তুলসী, হরিশ প্রমুখ।

কাশীপুর উদ্যানবাটীর বিচিত্র পরিস্থিতি। একদিকে জ্বলছে সন্ন্যাসের হোমকুণ্ড। অন্যদিকে সংসার তাপ-দগ্ধ মানুষের আনাগোনা। এদের মধ্যে অন্তরঙ্গ গিরিশচন্দ্র ঘোষ, রামচন্দ্র দত্ত, হারানচন্দ্র দাস, বৈকুণ্ঠনাথ, অতুল, নবগোপাল, হরমোহন, রামলাল চট্টোপাধ্যায়, মাস্টারমশাই (মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত ওরফে শ্রীম)-এর নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। ভারতবর্ষে তখন বৃটিশ শাসনের রমরমা। বৃটিশ ক্যালেন্ডারে উঁকি দিচ্ছে নববর্ষের সূর্য। তারিখটা ১ জানুয়ারি, ১৮৮৬ সাল। উদ্যানবাটীর বাগানে ঠাকুর আর তাঁর সামনে জনা-ত্রিশেক গৃহীভক্তের দল। একজনও গৃহত্যাগী নেই। এই সেই মাহেন্দ্রক্ষণ। ইতিহাস তাকিয়ে দেখল উনিশ শতকের বঙ্গজ রেনেসাঁর পূর্ণতাপ্রাপ্তি। জগৎ সাক্ষী হলো ঠাকুরের কৃপার। ঠাকুর আচমকা গিরীশ ঘোষকে জিজ্ঞাসা করলেন— "গিরিশ, তুমি যে সকলকে এত কথা (ঠাকুরের অবতারত্ব সম্বন্ধে) বলিয়া বেড়াও, তুমি (ঠাকুরের সম্বন্ধে) কী দেখিয়াছ ও বুঝিয়াছ।" ভাবে বিমোহিত নাট্যাচার্যের প্রত্যুত্তর— "ব্যাস-বাল্মীকি যাঁহার ইয়ত্তা করিতে পারেন নাই, আমি তাহার সম্বন্ধে অধিক কি আর বলিতে পারি।" কৃপা করলেন ভাবাবিষ্ট মুগ্ধ ঠাকুর —"তোমাদের কি আর বলিব, আশীর্বাদ করি তোমাদের চৈতন্য হউক।" গৃহীভক্তরা চাইছেন এই ঐতিহাসিক ক্ষণকে 'কল্পতরু' বলে নির্দেশ করতে, আর গৃহত্যাগীরা চাইছেন 'ঠাকুরের অভয়-প্রকাশ' বা 'আত্ম-প্রকাশ পূর্বক সকলকে অভয়-প্রদান' বলে তাকে অভিহিত করতে। আর এসবেরই নীরব দর্শক সেই কাশীপুর উদ্যান-বাটী।

অবতারবরিষ্ঠ জীবনের অন্তিম অধ্যায়ে অপূর্ব লীলাময় জগতের বিষহরি শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংস। শ্রীশ্রীমায়ের নিপুণ সেবাও ভোলবার নয়— 'ঠাকুরের পথ্য প্রস্তুত করিবার ভার কিন্তু পূর্বের ন্যায় শ্রীশ্রী মাতাঠাকুরাণীর হস্তেই রহিল। সাধারণ পথ্য ভিন্ন বিশেষ কোনরূপ খাদ্য ঠাকুরের জন্য ব্যবস্থা করিলে চিকিৎসকের নিকট হইতে উহা প্রস্তুত করিবার প্রণালী বিশেষরূপে জ্ঞাত হইয়া গোপালদাদা প্রমুখ দুই-একজন, যাহাদের সহিত তিনি নিঃসঙ্কোচে বাক্যালাপ করিতেন তাহারা যাইয়া তাঁহাকে উক্তপ্রণালীতে পাক করিতে বুঝাইয়া দিত। পথ্য প্রস্তুত করা ভিন্ন শ্রীশ্রী মাতাঠাকুরাণী মধ্যাহ্নের কিছু পূর্বে এবং সন্ধ্যার কিছু পরে ঠাকুর যাহা আহার করিতেন তাহা স্বয়ং লইয়া যাইয়া তাঁহাকে ভোজন করাইয়া আসিতেন।" (শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ)। শরৎ মহারাজ তাঁর 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ' নামক রামকৃষ্ণ মহাভারত (এক্ষেত্রে 'গীতা' অবশ্যই শ্রীম বিরচিত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত')-এর পঞ্চমভাগে এই ঐতিহাসিক বাড়িটির সম্পর্কে আনুপূর্বিক বর্ণনায় জানিয়েছেন উদ্যান-বাটীটি চৌদ্দ বিঘে জমির ওপর এবং আকারে তেমন বড় না হলেও বেশ রমণীয়।

শরৎ মহারাজের অনুপম বর্ণনা— "উত্তর-দক্ষিণে অপেক্ষা ওই চতুষ্কোণ ভূমির (কাশীপুর উদ্যানবাটীর) প্রসার পূর্ব-পশ্চিমে

সংরক্ষিত ঐতিহাসিক খেজুরগাছ— হাটে হাঁড়ি ভেঙে দিয়ে অশক্ত অবস্থায় এই গাছের তলা থেকেই সাপকে তাড়িয়ে ভক্তদের প্রাণ বাঁচিয়েছিলেন অন্তর্যামী ঠাকুর। ছবি ঃ শিবু ঘোষ

কিছু অধিক ছিল এবং উহার চতুর্দিক উচ্চ প্রাচীরবেষ্টিত ছিল। উদ্যানের উত্তর সীমার প্রায় মধ্যভাগে প্রাচীন সংলগ্ন পাশাপাশি তিন চারিখানি ছোট ছোট কুঠুরি রন্ধন ও ভাঁড়ারের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। ওই ঘরগুলির সম্মুখে উদ্যানপথের অপর পার্শ্বে একখানি দ্বিতল বাসবাটী;উহার নিচে চারখানি এবং উপরে দুইখানি ঘর ছিল। নিম্নের ঘরগুলির ভিতর মধ্যভাগের ঘরখানিই প্রশস্ত হলের ন্যায় ছিল। উহার উত্তরে পাশাপাশি দুইখানি ছোট ঘর, তন্মধ্যে পশ্চিমের ঘরখানি হইতে কাষ্ঠনির্মিত সোপান পরম্পরায় দ্বিতলে উঠা যাইত এবং পূর্বের ঘরখানি শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর জন্য নির্দিষ্ট ছিল। পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত পূর্বোক্ত প্রশস্ত হলঘর ও তাহার দক্ষিণের ঘরখানি— যাহার পূর্বদিকে একটি ক্ষুদ্র বারান্দা ছিল— সেবক ও ভক্তগণের শয়ন উপবেশনাদির নিমিত্ত ব্যবহৃত হইত। নিম্নে হলঘরখানির উপরে দ্বিতলে সমপরিসর একখানি ঘর, উহাতেই ঠাকুর থাকিতেন। উহার দক্ষিণে প্রাচীরবেষ্টিত স্বল্পপরিসর ছাদ, উহাতে ঠাকুর কখন কখনও পাদচারণ ও উপবেশন করিতেন এবং উত্তরে সিঁড়ির ঘরের উপরের ছাদ এবং শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর নিমিত্ত নির্দিষ্ট ঘরখানির উপরে অবস্থিত সমপরিসর একখানি ক্ষুদ্র ঘর, উহা ঠাকুরের স্নানাদির এবং দুই একজন সেবকের রাত্রিবাসের জন্য ব্যবহৃত হইত।"

আর নির্মল কুমার রায়ের সংযোজন— "ঠাকুরের দেহরক্ষার পর ভক্তরা যখন নানা কারণে এই উদ্যানবাটী ত্যাগ করে চলে যান, তখন থেকে এটি হস্তান্তর হতে থাকে এবং অবশেষে বেলুড়মঠ কর্তৃপক্ষ এটি ক্রয় করেন। বর্তমানে এটি বেলুড়মঠের অধীন। মঠ কর্তৃক অধিগ্রহণের পর পুরাতন জীর্ণ বাড়িটির অবলুপ্তি ঘটিয়ে সেই ভিটেতেই প্রাচীন মূল নকশা অনুযায়ী অবিকল একই ধাঁচে বর্তমান বাড়িটি নির্মিত হয় এবং ১৯৫৫ সালের ১ জানুয়ারি এটি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠার পর, এই বাড়িটিকেই মন্দিররূপে সযত্নে রক্ষা করা

(এরপর ১৪ পাতায়)

কেরিয়ারের ঠিক-ঠিকানা

মাউস দিয়ে মিকি মাউস

নীল উপাধ্যায়

বিজ্ঞাপন থেকে কম্পিউটার গেম্‌স— সর্বত্রই চাহিদা অ্যানিমেটরদের। সঠিক প্রশিক্ষণ থাকলে উচ্চ-বেতনের চাকরির অঢেল সুযোগ।

আধুনিক যুগে বিনোদনের স্বার্থে স্থির-চিত্রকেও গতিশীল হতে হয়েছে। আর সেই গতিদানের কাজটাই করেন অ্যানিমেশন বিভাগের পেশাদাররা। বর্তমানে শহরে ও মফস্বলে প্রতিষ্ঠান এবং সুযোগ-সুবিধা দুটোই সমান তালে বাড়ায় অ্যানিমেশনের দিকে এখন প্রার্থীদের ঝোঁক দারুণ। আর ভাল কোনও প্রতিষ্ঠান থেকে একটা কোর্স করে নিতে পারলে ভবিষ্যতও সুনিশ্চিত। আজকাল বিজ্ঞাপন, গেমিং, স্পেশ্যাল এফেক্ট, টিভির অনুষ্ঠান, অ্যানিমেশন ফিল্ম— এসবের সুবাদে প্রার্থীদের কাছে নিজের কাজের জায়গাটা বেছে নেওয়ার সুযোগও অনেক বেড়েছে।

গত ক'বছরের মধ্যে কলকাতায় অ্যানিমেশনের প্রচুর নাম করা প্রতিষ্ঠান তৈরি হয়েছে। এবং সেগুলির বেশির ভাগই প্রার্থীদের কোর্স করানোর পরে চাকরির সুযোগ করে দেয়।

অ্যানিমেশন-এ বহুবিধ বিভাগ আছে। সেইসব বিভাগে প্রার্থীদের দক্ষ করে তোলার জন্য রয়েছে বিভিন্ন কোর্স। অনেকের স্বপ্নের নগরী ওয়াল্ট ডিজনির স্টুডিওতেও নানা বিভাগে অ্যানিমেশন-এ অনেক কোর্স করানো হয়। স্টোরি লে-আউট, লাইটিং অ্যান্ড কম্পোজিং টেকনিক্যাল, মডেলিং ব্যাকগ্রাউন্ড, পেন্টিং টেকনিক্যাল, ভিসুয়াল ডেভেলপমেন্ট টেক্সার পেন্টিং টেকনিক্যাল, এফেক্টস্ অ্যানিমেশন, আর্ট অ্যান্ড প্রোডাকশন অ্যাসোসিয়েট প্রোগ্রাম ইত্যাকার কোর্সগুলির জন্য ন্যূনতম স্নাতকোত্তীর্ণ হতে হবে।

এছাড়া কলকাতার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে টু ডি, থ্রি ডি অ্যানিমেশন প্রি প্রোডাকশন এবং পোস্ট প্রোডাকশন, অ্যানিমেশন ফিল্ম মেকিং, পোর্টফোলিও ডেভেলপমেন্ট সংক্রান্ত বিভিন্ন কোর্স করানো হয়। কোর্সগুলির সময়সীমা সাধারণত ২৩—৩৩ মাস অবধি। এসব কোর্সের জন্য প্রার্থীদের ন্যূনতম যোগ্যতা উচ্চ মাধ্যমিক বা সমতুল উত্তীর্ণ। তবে শিক্ষাগত যোগ্যতার থেকেও এই ক্ষেত্রে প্রার্থীর দৃষ্টিভঙ্গি, আঁকার ক্ষমতা,

(এরপর ১৪ পাতায়)

।। চিত্রকথা ।। পরশুরাম ।। ১৯

জীবনে বিজ্ঞান

।। নির্মল কর।।

এক চুমুকে দীর্ঘজীবন

একজন মানুষের হার্ট সুস্থ থাকে আর্টারির সঙ্কোচন ও সম্প্রসারণের সঠিক মাত্রার জন্য। একজন প্রাপ্তবয়স্ক যদি দিনে দু'কাপ কফি নিয়মিত পান করেন, তবে তাঁর হৃৎস্পন্দন ৫৬ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। লিকারিয়া গ্রিক আইল্যান্ডে ৬৫—১০০ বছর বয়স্ক হাই ব্লাডপ্রেসার রোগীর উপর পরীক্ষা চালিয়ে দেখা গিয়েছে তাঁদের গড় আয়ু বেড়ে হয়েছে ৯০ বছর। এই কারণে দ্বীপটি ল্যান্ড অব লংজিভিটি নামে পরিচিত।

জিন থেকেই চোখের রোগ

মাইওপিয়া বা কোনও জিনিস অস্বচ্ছ ভাবে দেখার জন্য দায়ী যে জিন তাকে খুঁজে পাওয়া গিয়েছে বলে দাবী করেছেন লন্ডনের বিজ্ঞানীরা। তাঁদের গবেষণায় দেখা গিয়েছে, চোখের সার্বিক বৃদ্ধি তে RAFGRF-1 নামক জিনের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর কাজের উপরই নির্ভর করে দৃষ্টির স্বচ্ছতা। বহু মানুষের জিন নিয়ে গবেষণায় দেখা গিয়েছে, যেসব রক্তে এই জিনের সংখ্যা বেশি সেইসব মানুষের ক্ষেত্রে এই রোগের সম্ভাবনাও বেড়ে যায়। কিন্তু রোগের কারণ যখন জানা গিয়েছে, অদুর ভবিষ্যতে দুর্বল দৃষ্টিকে শক্তিশালী করতে চশমার সাহায্য আর লাগবে না।

রক্তদানে হৃদরোগে ঝুঁকি কমায়

রক্ত জীবন বাঁচায়। বারবার রক্ত দিলে শরীরের বাড়তি আয়রন কমে। বাড়তি আয়রন কিন্তু ফ্রি-র‌্যাডিক্যাল তৈরি করে, যা স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। সুতরাং রক্ত দেওয়া একদিক থেকে স্বাস্থ্য ভাল রাখার উপায়ও। এটাও জানা যায়, রক্তদান পুরুষদের হার্টের অসুখ হওয়ার ঝুঁকি কমায়।

একবার চার্জেই হাজার কি-মি

পৃথিবীতে ক্রমেই কমে আসছে সঞ্চি ত শক্তির ভাণ্ডার। তাই বিজ্ঞানীরা বিকল্প শক্তির সন্ধানে আবিষ্কার করেছেন ব্যাটারি চালিত গাড়ি। জাপানের স্যানিও কোম্পানি এমন এক ব্যাটারি তৈরি করেছে যা চার্জ দিলে গাড়িটি টানা ২৭ ঘণ্টা চলবে, দৌড়বে ১০০০ কিমি। সম্প্রতি ব্যাটারি চালিত এই গাড়ির টেস্ট রাইড হয়ে গেল রেসিং কোর্সে টানা ২৭.৫ ঘণ্টা। ওই সময় গাড়িটির গতিবেগ ছিল ঘণ্টায় ৪০ কিমি। ব্যাটারি চালিত গাড়ির ক্ষেত্রে এটি বিশ্ব রেকর্ড।

র/ঙ্গ/কৌ/তু/ক

হিমু ঃ জানিস, আমার বউটা রোজ ভোর পাঁচটা অবধি জেগে বসে থাকে।

নিমু ঃ কেন, সারা রাত করে কী?

রবি ঃ আমার বাড়ি ফেরার অপেক্ষা করে।

* * *

শিক্ষক ঃ বল্ দেখি, যীশুখ্রিস্ট, গুরু নানক আর গান্ধীজীর মধ্যে সাদৃশ্য কোথায়?

ছাত্র ঃ এঁরা প্রত্যেকেই সরকারি ছুটির দিনে জন্মেছিলেন স্যার।

* * *

ঝুপু ঃ অনুষ্ঠানে গাইবার সময় তুই সারাক্ষণ চোখ বুজে থাকিস কেন?

রুপু ঃ নিজের চোখে শ্রোতাদের কষ্টটা দেখতে পারি না বলে।

* * *

গিন্নি (ঝগড়ার পর) ঃ আমি মনে হয় পাগল ছিলাম তাই তোমাকে বিয়ে করতে রাজি হয়েছিলাম।

কর্তা ঃ আর আমি তোমার প্রেমে এমন হাবুডুবু খেয়েছিলাম যে, খেয়ালই করিনি তুমি পাগল।

* * *

স্বামী ঃ আমার ভুলে যাওয়া রোগটা নিয়ে ডাক্তারের কাছে গিয়েছিলাম গো!

স্ত্রী ঃ ডাক্তার কী বললেন?

স্বামী ঃ কিছুই বলেন নি। তবে দেখার আগে আমার কাছ থেকে ফি-টা নিয়ে নিলেন।

—**নীলাদ্রি**

মগজচর্চা

১। নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত গীতাঞ্জলির ইংরেজী অনুবাদ 'সঙ অফারিংস'-এ মোট ক'টি কবিতা ছিল?

২। ভারতের জাতীয় পতাকার নকশা তৈরি করেছিলেন কে?

৩। বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবস কবে? ১৫ অগস্ট/১৬ ডিসেম্বর/৩ মে।

৪। 'গোল' কোন্ বিখ্যাত ভারতীয় ক্রীড়াবিদের আত্মজীবনী।

৫। কোন্ ভারতীয় প্রথম ম্যাগ্‌সাইসাই পুরস্কার পেয়েছেন?

—**নীলাদ্রি**

উত্তর ঃ

১। ১০৩টি

২। পিঙ্গালি ভেঙ্কাইয়া

৩। ২৬ মার্চ

৪। ধ্যানচাঁদ

৫। আচার্য বিনোবা ভাবে

আলোয় ঘেরা অন্ধকারে

(৩ পাতার পর)

শিল্প ছড়িয়ে দিলে উন্নয়নের আঞ্চলিক ভারসাম্যও নিশ্চিত হয়— (গানার- মীর্ডাল- ইকনমিক থিওরী অ্যান্ড আন্ডার-ডেভেলাপ্‌ড্‌ রিজিয়নস, পৃঃ ১৮)।

চতুর্থত, হুণ্ডাই, মারুতি, হিন্দ্‌মোটর প্রভৃতি কারখানার জমির পরিমাণ ৩০০-৩৫০ একর। তাহলে টাটার জন্য ৯৯৭ একর ও সালেমের জন্য ৬৫,০০০ একর জমি লাগবে কেন? এর ফলে কৃষিও হলো না, শিল্পও গড়ে ওঠেনি। এক্ষেত্রেও বেশি দরকার ছিল সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগে বহু কৃষি-অনুসারী শিল্প গড়ে তোলা। আরও দরকার ছিল শান্তি ও সম্মতির মাধ্যমে এটা করা—(অম্লান দত্ত— 'পরিবর্তন-প্রহেলিকা', দৈনিক স্টেটসম্যান, ২৫, ২, ৬৭)।

ষষ্ঠত, সব চেয়ে বড় ত্রুটি থেকে গেছে আসল জায়গায়। ডঃ সন্তোষ ভট্টাচার্য মন্তব্য করেছেন— দরকার একটা শিল্প বিপ্লবের। সেই রকম একটা বিপ্লব ঘটাতে গেলে সমাজের আর্থিক কর্মকাণ্ডের সর্বক্ষেত্রে যে পরিবর্তন দরকার, যে উদ্যোগ প্রয়োজন, সেই রকম সার্বিক প্রচেষ্টার কোনও লক্ষণ নেই, এমন কি তার নীতিগত স্বীকৃতিও নেই,— (চিন্তার মুক্তি, পৃঃ ২৩৩)।

এবার মূল-বিষয়টা দিয়ে প্রসঙ্গটা শেষ করব।

এত টাকা ঋণ নিয়ে কোন মহৎ কাজ করা গেছে? কার উপকার হয়েছে এতে? সম্প্রতি জানা গেছে— আফ্রিকার হতদরিদ্র ২৬টা দেশের থেকেও গরীব এই দেশের আটটা রাজ্য— তার মধ্যে রয়েছে বাম-শাসিত পশ্চিমবঙ্গও। এটা মমতা ব্যানার্জীর রাজনৈতিক ভাষণ নয়— রাষ্ট্রসঙ্ঘের রিপোর্ট। ইউ এন ডি পি-র সাহায্যে 'অক্সফোর্ড পভার্টি' এবং 'হিউম্যান ডেভেলাপমেন্ট ইনিসিয়েটিভ'-এর যৌথ উদ্যোগে দারিদ্র্যের যে বহুমাত্রিক সমীক্ষা করা হয়েছে, তাতে এই মর্মান্তিক তথ্যটা উদঘাটিত হয়েছে।

কেন এমনটা হলো? ৩২ বছরের 'গরীবের পার্টির' উদ্যোগে গরীবের কি উপকার ঘটল? কোথায় গেল লক্ষ কোটি টাকার ঋণের অঙ্কটা? কিছু কর্তা, নেতা ও করিৎকর্মা কম্‌রেড ফুলে-ফেঁপে উঠেছেন জানি— কিন্তু সেই ঋণ শোধ করবেন সাধারণ মানুষ?

শিক্ষায় কিছু হয়নি। বছরে পঁচিশ লাখ ছেলেমেয়ে প্রাইমারীতে ভর্তি হয়— মাধ্যমিক পরীক্ষা দেয় মাত্র লাখ পাঁচেক। বাকিরা 'ড্রপ্‌ আউট'— তারা স্কুল ছেড়েছে। ময়লা কাগজ খোঁজে, চায়ের দোকানে কাপ-ডিস ধোয়। বহু স্কুলে ছাদ নেই, বেঞ্চ নেই, বোর্ড নেই— শিক্ষকও নেই। অনেক জায়গায় মিড্‌ ডে মিল্‌ দেওয়া হয়, তাই ছোটরা যায়— অভিভাবক ভাবেন পড়াশোনা যা-ই হোক, একবেলা তো বাচ্চার খাবার জুটল। তবে পড়াটা কেমন হয় বুঝি! কারণ, রান্নাটা শিক্ষকদেরই করতে হয়। অনেক জায়গায় তারও দরকার হয় যা— হেড্‌মাস্টার চান্স নিয়ে পালিয়ে যান।

কলেজে অর্থাভাবে ফুল-টাইম শিক্ষক নেওয়া হয় না, লাইব্রেরীতে নতুন বই কেনা হয় না। স্পনসর্ড কলেজের দায়-দায়িত্ব সরকারের, কিন্তু তাদের বলা হয়— ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করে টাকা তোলার জন্য। ফলে ক্লাসে তাদের সংখ্যা ৩০০ হয়ে যায়।

আর স্বাস্থ্য-পরিষেবা? সেটা তো বেসরকারী মুনাফাকারীদের হাতে চলে গেছে। চারদিকে অজস্র নার্সিংহোম টাকা কামাচ্ছে। অপারগরাই সরকারী হাসপাতালে যান— অপেক্ষা করেন ডেথ্‌ সার্টিফিকেটের জন্য। সেখানে বেড়ালে শিশুকে খায়, ইঁদুরে রোগীর চোখ তুলে নেয়। আগে ওষুধ-পথ্য দেওয়া হোত—এখন বাড়ি থেকেই দিতে হবে।

পরিবহণ-ব্যবস্থাও তো বেসরকারী মিনি-অটোর হাতে। সরকারের আয় হবে কোথা থেকে?

অথচ চা-বাগানে অনাহারে মৃত্যুর মিছিল চলছে— ধনিরাম গঞ্জ, কাঞ্জি ঢোলি মারা গেছেন। মালদায় মাইনো বাস্কে দু-হাজার টাকায় ছেলেকে বিক্রি করেছেন— আর দুজনকেও বেচে দিতে চান। আমলাশোলে কয়েকজনের মৃত্যুটা অনাহারে নাকি অপুষ্টিতে, সেটা নিয়ে বিতর্ক চলছে। জঙ্গলমহলে দেড় বছর ধরে মাওবাদী ধরার জন্য হানা দেওয়া চলছে। অথচ সেখানে মানুষ লতাপাতা, পিঁপড়ের ডিম, ডুমুর, সাপ ইত্যাদি খেয়ে আছেন। না আছে পানীয় জল, না স্কুল, না হেলথ সেন্টার, না রুজি-রোজগারের ব্যবস্থা। বিদ্যুৎও যায় না। এইসব জায়গায় সন্ধ্যে হলেই সব অন্ধকার। না, সন্ধ্যে হলেই নয়— এখানে জীবনটাই অন্ধকারে ঢাকা। জীবনটা মৃত্যুর প্রতীক্ষাতেই থাকে। তাহলে ঋণের সেই বিপুল অঙ্কের টাকাটা কোথায় গেল?

শোক-সংবাদ

গত ৭ ডিসেম্বর হুগলি জেলার মগরায় শ্রীমতী প্রতিমা ঘোষ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে পরলোক গমন করেন। তিনি ছিলেন সঙ্ঘের পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন বৌদ্ধিক প্রমুখ বাসুদেব ঘোষের একমাত্র ভগিনী। মৃত্যুকালে স্বামীসহ পুত্র কন্যা, জামাতা, নাতি-নাতনি ও আত্মীয়-স্বজনদের রেখে গেছেন।

* * *

গত ৩ ডিসেম্বর আর এস এসের দক্ষিণ অসম প্রান্তের শ্রীভূমি জেলা ব্যবস্থা প্রমুখ আশিস চক্রবর্তীর মাতৃদেবী ৮৬ বছর বয়সে বার্ধক্যজনিত কারণে পরলোক গমন করেন। মৃত্যুকালে তিনি দুই পুত্র, পুত্রবধূ, কন্যা-জামাতা, নাতি - নাতনি, আত্মীয়স্বজনদের রেখে গেলেন।

* * *

গত ৩ ডিসেম্বর রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের কোচবিহার নগর সঙ্ঘচালক নিশিকান্ত দাস পরলোক গমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৩ বছর। তিনি স্ত্রী, দুই পুত্র, এক কন্যা, এক পুত্রবধূ ও জামাতা সহ আত্মীয়-স্বজনদের রেখে গেছেন।

* * *

সঙ্ঘের কোচবিহার জেলার সহ-জেলা কার্যবাহ সুশীল কুমার বিশ্বাসের পিতৃদেব গৌরচন্দ্র বিশ্বাস গত ২৮ নভেম্বর সকালে ১০৩ বছর বয়সে পরলোক গমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর তিন পুত্র, পুত্রবধূ ও নাতি-নাতনি বর্তমান।

* * *

গত ১৪ ডিসেম্বর পরলোক গমন করেছেন বালুরঘাট নিবাসী দেবীদাস চৌধুরী। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮২ বছর। তিনি ভারতীয় জনসঙ্ঘের পশ্চিম দিনাজপুর জেলা সভাপতি ও পরবর্তীকালে ভারতীয় জনতা পার্টির জেলা সম্পাদক ও সহ-সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন। তাঁর দুই পুত্র ও দুই কন্যা বিভিন্ন সমাজ সেবামূলক কাজের সঙ্গে জড়িত। তাঁর কনিষ্ঠা কন্যা দেবশ্রী চৌধুরী বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ বি জে পি-র রাজ্য-সম্পাদিকা। তাঁর মৃত্যুতে সঙ্ঘ পরিবার একজন আদর্শনিষ্ঠ স্বয়ংসেবক তথা নিঃস্বার্থ সমাজসেবীকে হারাল।

হাটে হাঁড়ি ভেঙ্গে দিলেন

(১১ পাতার পর)

হয়। এখানে ঠাকুরের কোনও পৃথক মন্দির নেই, বা মূর্তিও নেই। এই বাড়ির দোতলায় যে ঘরে ঠাকুর অবস্থান করেছিলেন এবং শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন, সেই ঘরের মেঝের ওপর ঠাকুরের শয্যা প্রস্তুত করে, সেখানে তাঁর প্রতিকৃতি বসানো আছে, যেখানে নিত্যপূজা, ধ্যান-জপ প্রভৃতি হয়। নীচের যে ঘরটিতে শ্রীশ্রীমা অবস্থান করতেন সেখানেও মায়ের প্রতিকৃতিতে নিত্যপূজা হয়।"

পুনশ্চ ঃ কাশীপুর উদ্যানবাটীতেই প্রমাণিত হয়েছে যে শ্রীরামকৃষ্ণ নীলকণ্ঠ। জগতের সমস্ত পাপকে, সব অন্যায়কে তিনি স্বীয় কণ্ঠে ধারণ করেছিলেন কণ্ঠরোগের মাধ্যমে। তাঁর অবতারবরিষ্ঠায়বাদে সন্দেহবাদীদের জ্ঞাতব্য তথ্য— কাশীপুর উদ্যানবাটীতে অবস্থানকালে শ্রীরামকৃষ্ণদেব যখন কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে তাঁর ঘরে শয্যাশায়ী ছিলেন এবং অপরের সাহায্য ছাড়া পাশ ফিরতেও অক্ষম বলে বোধ হোত, তখন যুবক ভক্তদের মধ্যে কারুর কারুর খুব ইচ্ছে হলো, উদ্যানের বৃহত্তম পুষ্করিণীর দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে অবস্থিত খেজুর গাছের মিষ্টি রস পান করতে। ঠাকুরকে এই বিষয়টা কেউ না জানালেও অন্তর্যামী ঠাকুর সবই জানতে পারেন। একমাত্র ঠাকুরই জানতেন ওই খেজুর গাছের গোড়ায় একটি বিষাক্ত ও রাগী সাপ বাস করে। তিনি কাউকে এই বিষয়টা না জানিয়ে দ্রুতগতিতে নিজেই শয়নগৃহ থেকে নেমে এসে সাপটিকে তাড়িয়ে দেন। এই অদ্ভুত ও অসাধ্য-সাধনের প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী স্বয়ং। এই ঘটনাটি তিনিই পরে বলেন। ঠাকুর ঠিকই বলেছিলেন, "যখন অধিক লোকে (তাঁহার দিব্য মহিমার বিষয়) জানিতে পারিবে, কানাকানি করিবে তখন (নিজ শরীর দেখাইয়া) এই খোলটা আর থাকিবে না, মা-র (জগন্মাতার) ইচ্ছায় ভাঙিয়া যাইবে। পাঠক, হাটে হাঁড়ি ভাঙলেন প্রাণের ঠাকুর?

শব্দরূপ - ৫৬৬

মিতু দত্ত

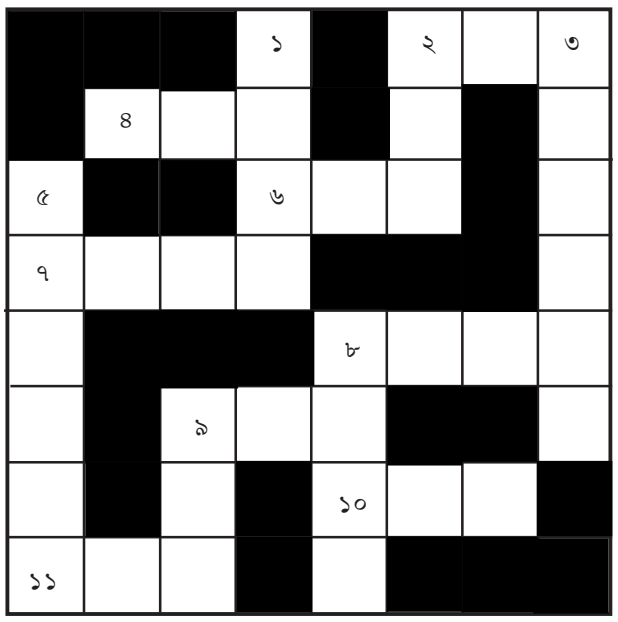

সূত্র ঃ

পাশাপাশি ঃ ২. দর্শনের ন্যায়শাস্ত্র বিভাগের ও ঋক্‌বেদের অনেক মন্ত্রের রচয়িতা, ইনি শতানন্দ নামেও পরিচিত, শেষ দুয়ে অন্ধকার, ৪. বৈবস্বত মনুর দশটি পুত্রের অন্যতম, প্রথম দুয়ে আকাশ, ৬. গোরক্ষক, পরে 'রাজ' রাখলে শ্রীকৃষ্ণ,৭. মিথিলার রাজা জনকের ভ্রাতা, এক-দুয়ে রামতনয়, ৮. সূর্য চন্দ্র মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি শুক্র শনি রাহু ও কেতু এদের যা বলা হয়, ৯. ধনের দেবতা, ১০. নীল-পীত মিশ্রিত বর্ণ সমার্থে সূর্যের অশ্ব, ১১. লেবু সমার্থে লক্ষ্মীদেবীর এক নাম।

উপর-নীচ ঃ ১. বাসুকি দক্ষকন্যা কদ্রুর জ্যেষ্ঠ পুত্র, এঁর পিতা মহর্ষি কশ্যপ, ২. শ্রীকৃষ্ণ, ৩. যম, ৫. এখানে দুর্যোধনের মাতুল ও মামাতো ভাই, মধ্যে ইঙ্গ নতুন, ৮. নিম্নাঙ্গ সিংহের আকৃতি-বিশিষ্ট বিষ্ণুর চতুর্থ অবতার, ৯. রাধিকার ননদিনী।

সমাধান শব্দরূপ - ৫৬৪

সঠিক উত্তরদাতা

শৌনক রায়চৌধুরী
কলকাতা-৭০০০০৯
রাজর্ষি দত্ত
শিবপুর, হাওড়া

■	ভৈ	র	বী	■	প	■	■
■	■	ক	■	■	ব	ছ	র
ন	■	বা	তি	দা	ন	■	জ
দে	রা	জ	■	ঙ্গ	■	■	নী
র	■	■	সা	■	সা	ধি	কা
চাঁ	■	ন	চি	কে	তা	■	ন্ত
দ	রা	জ	■	■	ত্ত	■	■
■	■	র	■	পা	র	ণ	■

সমাধান শব্দরূপ - ৫৬৫

সঠিক উত্তরদাতা

শৌনক রায়চৌধুরী
কলকাতা-৭০০০০৯
অশোক রায়
দমদম, কলকাতা-৫২

■	■	প	র	শু	রা	ম	■
■	■	■	ক্ষা	■	■	গ	■
তা	রা	■	কা	লী	সা	ধ	ক
■	কা	পা	লী	■	হে	■	■
■	■	য়	■	হু	ব	হু	■
অ	প	রা	জি	তা	■	রি	পু
■	দ	■	■	শ	■	■	■
■	বি	বে	কা	ন	ন্দ	■	■

শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়। খামের ওপর লিখুন 'শব্দরূপ'।

● ৫৬৬ সংখ্যার সমাধান আগামী ১৭ জানুয়ারি, ২০১০ সংখ্যায়

সত্যজিৎ রায়ের কাহিনী অবলম্বনে

সন্দীপ রায়ের ছবি 'গোরস্থানে সাবধান'

বিকাশ ভট্টাচার্য

শীতের ছুটি পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই এবার এসে গেছে ফেলুদার অ্যাডভেঞ্চারের ছবি 'গোরস্থানে সাবধান'। বাংলা সাহিত্যের এক বিস্ময়কর চরিত্র সত্যজিৎ রায়ের রহস্য-রোমাঞ্চ সিরিজের গোয়েন্দা ফেলুদা অর্থাৎ কলকাতার রজনী সেন রোডের প্রদোষ চন্দ্র মিত্র। রহস্যের জট ছাড়াতে তাঁকে দেশ-বিদেশের নানা জায়গায় ছুটতে হয়েছে। কিন্তু কলকাতার ছেলে ফেলুদাকে তাঁর নিজের শহরেও রহস্যের সন্ধানে কম ঘুরতে হয়নি। এই এবারেই সাউথ পার্ক স্ট্রিট গোরস্থানে রাতের অন্ধকারে দেড়শো বছরের পুরোনো এক কবর খোঁড়াখুড়িকে কেন্দ্র করে যে রহস্য দানা বেঁধেছে তাই ভেদ করতে নেমে পড়েছেন ফেলুদা। কবরটা ১৮৫৮-তে মৃত টমাস গডউইনের। কি আছে সেই কবরে? কেন নরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস নামে এক প্রৌঢ় ওই কবরের পাশে গুরুতর জখম অবস্থায় পড়েছিলেন? আর রাতের অন্ধকারে তিনি গোরস্থানে কি করছিলেন? রহস্য ভেদ করতে নেমে তিনি জানতে পারলেন টমাস আসলে ইংলন্ডের ছেলে। সে দেশে বসে নবাবীর শানদার গল্প শুনে এসে হাজির হলো লখনৌতে। সাদাত আলি তখন লখনৌ-এর নবাব। টমাস নবাবের মন ভিজিয়ে হেঁসেলের কাজে ঢুকে গেল। নিত্য নানা মুখরোচক খাবার খাইয়ে নবাবের থেকে প্রত্যেকদিনই পেত নানান বক্‌শিস্‌। তারপর একদিন নবাবের আওতা থেকে বেরিয়ে চলে এল কলকাতায়। হাতে তখন প্রচুর অর্থ। বিয়ে করল। ছেলেমেয়ে হলো। কিন্তু অসংযমী, জুয়াড়ি টমাস মারা যায় খুবই দৈন্যদশায়। এমনই ফেলুদা জেনেছেন রহস্যের পেছনে ছুটে। টমাসের মৃত্যুর দু-তিনমাস পরে তার একমাত্র মেয়ে শার্লট একটা প্রবন্ধ লিখেছিলেন ক্যালকাটা রিভিয়্যুতে। তাকে নিশানা করে ফেলুদা এগিয়ে চললেন। ধীরে ধীরে জানলেন অবিবাহিতা শার্লট এবং তার দুই ভাই ইতিমধ্যেই মারা গেছেন। বেঁচে আছেন কেবলমাত্র বড়ভাই ডেভিডের দুই ছেলে মার্কাস ও ক্রিস্টোফার। এদের সঙ্গে যোগাযোগ করে জানতে পারলেন বেশ কিছু তথ্য। যা থেকে শেষপর্যন্ত রহস্যভেদ করতে সক্ষম হন তিনি। টক্কর হয় ধনাঢ্য মহাদেব চৌধুরীর সঙ্গে, যার পোষা গুন্ডার সঙ্গে

ফাইটিং-ও হয়।

সে সব পর্দায় দেখাই ভালো। রহস্যের আগাম খবর এখানে দিয়ে দিলে ছবি দেখার মজাটাই নষ্ট হয়ে যায়। তবে ইতিপূর্বের 'বোম্বাইয়ের বোম্বেটে', 'কৈলাশে কেলেঙ্কারী' বা 'টিনটোরেটোর যিশু' ইত্যাদি ছবিতে পরিচালক সন্দীপ রায় কাহিনীর সাহায্য নিয়ে মারপিট, পিস্তলের লড়াই, কার চেজিং ইত্যাদির মাধ্যমে ছবিতে যে টানটান উত্তেজনার সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন, এ ছবিতে তা সম্ভব হয়নি। কারণ 'গোরস্থানে সাবধান'-এ ফেলুদা সবচেয়ে বেশী ব্যবহার করেছেন মগজাস্ত্র। ছবির পরতে পরতে আছে ডিটেকশন। খুব মনযোগ দিয়ে ছবিটা না দেখলে দর্শকেরা খেই হারিয়ে ফেলবেন।

ছবির ফটোগ্রাফি অসাধারণ। বিশেষ করে শুরুতেই ঝড়জলের রাতে বিদ্যুৎ চমকের মধ্যে ক্যামেরা যেভাবে গোরস্থানে ঘুরে বেড়িয়েছে— তা সত্যিই প্রশংসনীয়। তবে এ ছবি দেখতে গিয়ে কলকাতা, বিশেষ করে পুরোনো কলকাতার হদিশ পাওয়া গেল না। যেটা সত্যজিৎ রায় তাঁর ছবিতে আমাদের দিতেন। বেনারস, রাজস্থানের মরুপ্রান্তর সত্যজিতের ছবিতে যেভাবে বাঙ্ময় হয়েছে— তা পাওয়া গেল না। রিপন লেনে টমাসের বংশধর ক্রিম গডউইনের বাড়ি খুঁজতে গিয়ে ওই ঘিঞ্জি অঞ্চলের ছবি খুব সুন্দরভাবে দেখানো যেত— কিন্তু তা হয়নি। পুরোনো কলকাতায় কিছু স্টিল ফটো আর এখনকার চলে আসা হাইকোর্ট, হাওড়া ব্রীজ, ভিক্টোরিয়ার আলোকিত ছবির ঝলক দেখিয়ে সন্দীপ কাজ সেরেছেন।

অসাধারণ এ ছবির সংলাপ। টুকরো টুকরো কথা, মন্তব্য শুনে মন ভরে যায়। তবে এ ব্যাপারেও চিত্রনাট্যকার সন্দীপকে খুব একটা মাথা ঘামাতে হয়নি। মূল কাহিনীতেই সত্যজিৎ যে ভাবে চরিত্রগুলোর মুখে সংলাপ বসিয়েছেন, ছবিতেও ঠিক সেভাবেই তা সন্দীপ তা ব্যবহার করেছেন। শুধু চলচ্চিত্র বলে শট্‌ ডিভিশনটা পরিচালককে করতে হয়েছে। ক্যামেরার অ্যাঙ্গেল ঠিক করতে হয়েছে। অবশ্য তা পরিচালক মুন্সীয়ানার সঙ্গেই করেছেন।

সত্যজিৎ রায় তাঁর নিজের ফেলুদা সিরিজে যে আবহ ব্যবহার করতেন, এখানেও যেটা ব্যবহৃত হয়েছে। তবে সঙ্গীত পরিচালক হিসেবে সন্দীপ রায় ছবির শুরু থেকে যে আবহসঙ্গীত ব্যবহার করেছেন তা সম্পূর্ণ নিজের রচনা এবং অবশ্যই তা ছবির রহস্য সৃষ্টিতে সাহায্য করেছে।

অভিনয়ে সব্যসাচী চক্রবর্তী তাঁর স্বভাবসুলভ অভিনয়ে ফেলুদাকে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলেছেন। তবে তিনি যত বড় অভিনেতাই হোন না কেন, বয়সটা তো লুকোতে পারবেন না। মধ্যপ্রদেশে যথেষ্ট চর্বি জমেছে। সন্দীপ রায়ের উচিৎ এখন থেকেই পরবর্তী ফেলুদাকে খুঁজে বার করা। শুনেছি স্বয়ং সব্যসাচীও চান দর্শকদের মধ্যে তার চাহিদা থাকতে থাকতেই ফেলুদার চরিত্রে অভিনয় থেকে অবসর নেওয়া। পরমব্রতের জায়গায় তোপসের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন অল্পবয়সী সাহেব ভট্টাচার্য। তাকে মানিয়ে গেছে। বিভু ভট্টাচার্য সাবলীল অভিনয় করে ধীরে ধীরে জটায়ুর চরিত্রে স্বাভাবিক হয়ে উঠছেন। অন্যান্য ভূমিকায় ধৃতিমান চট্টোপাধ্যায়, তিনু আনন্দ, তমাল রায়চৌধুরী নিজ নিজ চরিত্রে সুন্দর অভিনয় করেছেন। সব মিলিয়ে 'গোরস্থানে সাবধান' দর্শকদের ভালোই লাগবে।

লালফিতের ফাঁস না উপেক্ষা?

বিকাশ ভট্টাচার্য।। পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রতিবছর সাহিত্য, কাব্য, নাটক, লোককথা ইত্যাদির ক্ষেত্রে অসামান্য অবদানের জন্য নানাজনকে বিবিধ পুরস্কার দেন। নাট্যক্ষেত্রে এই পুরস্কার দীনবন্ধু মিত্র ও গিরিশ চন্দ্র ঘোষের নামে দেওয়া হয়। এবার দশম নাট্যমেলায় এইসব পুরস্কার প্রদান করা হয়। আশ্চর্যের বিষয় এই যে এবার পুরস্কার দেওয়া হলো ২০০৬, ২০০৭, ২০০৮ এবং ২০০৯ সালের জন্য। প্রশ্ন কেন চার বছরের পুরস্কার একই সঙ্গে হরির লুটের বাতাসার মতো দেওয়া হলো? অতীতে এই পুরস্কার পৃথক অনুষ্ঠান করে অত্যন্ত মর্যাদার সঙ্গে প্রাপকদের হাতে তুলে দেওয়া হোত। চার বছর তা বন্ধ ছিল? কেন? নাট্যমেলাতেই যদি পুরস্কার দেওয়া হয় তবে ২০০৬-এরটা কেন ২০০৭-এর মেলায় দেওয়া হলো না? পুরস্কার প্রদান করেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং। তিনি বা নাট্য আকাদেমির কর্ণধার কেউ-ই কিন্তু তাঁদের বক্তব্যে বলেননি কেন ৪ বছর ধরে এই সম্মান পুরস্কার দেওয়া যায়নি? নাট্য আকাদেমির সব কাজ নিশ্চয়ই চার বছর বন্ধ ছিল না। রাজ্য সরকার এই পুরস্কার অর্থ দেন সাধারণ মানুষের করের টাকায়। আমরা সাধারণ মানুষেরা গুণীজনেদের প্রতি এই উপেক্ষাকে সহজভাবে মানতে পারছি না। কারণ 'সময়' একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। তাকে অবহেলা করা এক অর্থে অনেক কিছুকে বাতিল করা।

শঙ্করাচার্যের সাহিত্য

(৮ পাতার পর)

ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষা বর্জনের ফলে শুধু কয়েকটি মঠ ও মিশনের মধ্যে শঙ্করাচার্য আবদ্ধ রয়ে গেছেন। জনসাধারণের মধ্যে জাতীয় মানসিকতায় শঙ্করাচার্য এখনও প্রতিষ্ঠিত হননি বা আমরা করতে পারিনি— এটা আমাদের হিন্দুদেরই অপদার্থতা। অথচ এই সব কাজের দ্বারা শঙ্করাচার্য সনাতন ধর্মকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে গেছেন, নতুবা সনাতন ধর্ম বিলুপ্ত হয়ে যেতে পারতো। সমস্ত হিন্দুদের আছে, বিশেষতঃ বর্তমান প্রজন্মের মধ্যে ধর্মকে দৃঢ়ভাবে ধরে রাখবার জন্য আলোচ্য গ্রন্থটির বহুল প্রচার কামনা করি। বইটির প্রচ্ছদপটে শঙ্করাচার্যের সুন্দর ছবিটি মাধুর্যমণ্ডিত। পৃষ্ঠাসংখ্যা ১৪৪।

'শিবাবতার আচার্য শঙ্কর'—লেখক ঃ শ্রীমৎ দেবানন্দ ব্রহ্মচারী। প্রকাশক—শ্রী ধ্রুবানন্দ ব্রহ্মচারী, প্রেমপ্রবাহ প্রকাশন, প্রেমমন্দির আশ্রম, রিষড়া, হুগলি। মূল্য ঃ ৫০ টাকা।

মাউস দিয়ে মিকিমাউস

(১২ পাতার পর)

কল্পনাশক্তি, গল্পাকারে ভাববার ক্ষমতা যাচাই করে নেওয়া হয়। এজাতীয় কোর্সে ভর্তির জন্য প্রার্থীদের লিখিত, ড্রয়িং এবং ইন্টারভিউ নেওয়া হয়।

প্রশিক্ষণের জন্য যোগাযোগ করা যেতে পারে নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠানে ঃ

১। এরিনা মাল্টি মিডিয়া, ৬০-এ, চৌরঙ্গি রোড, ৪র্থ তল, কলকাতা-২০। ফোন ঃ ০৩৩-২২৮১-৩৬৬৭।

২। মায়া অ্যাকাডেমি অব্‌ অ্যাড্‌ভান্সড সিনেম্যাটিক্স, ৭৪, বিডন স্ট্রিট, গিরিশ পার্ক মেট্রো স্টেশনের কাছে, কলকাতা। ফোন ঃ ০৩৩-৬৫১৫-৫২৯৭।

৩। ইনস্টিটিউট অব্‌ মাস কমিউনিকেশন ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন স্টাডিজ, ১৮৮/৫৭, প্রিন্স আনোয়ার শাহ্‌ রোড, কলকাতা-৪৫। ফোন ঃ ০৩৩-২৪১৭-৩২৪৭।

দিগ্বিজয়-রাহুলের মতো 'সন্ত্রাসে মদতকারী' থাকতে পাকিস্তানের চিন্তা নেই

শিবাজী গুপ্ত

গত ১৫ ডিসেম্বরের আনন্দবাজারে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে সন্ত্রাসীমূলক কার্যক্রমে লিপ্ত থাকার অভিযোগে ৩১ জন "মোস্ট ওয়ান্টেড" জঙ্গির তালিকা প্রকাশিত হয়েছে। এরা নাকি উত্তর ও দক্ষিণ ভারত মিলিয়ে ৬টি রাজ্যে আস্তানা গেড়ে আছে সুযোগের অপেক্ষায়। কেউ বা বিদেশে ভ্রমণরত। অবশ্যই মুসলিম সন্ত্রাসবাদী দেশগুলিতে অর্থ ও শস্ত্রের খোঁজে। এদিকে দেশে একের পর এক সন্ত্রাসী আক্রমণ চলছে মঠ-মন্দির রেলস্টেশন ধর্মীয় সমাবেশ— এমন কি শ্মশানঘাটে পর্যন্ত। পাঁচ-সাত রকম পুলিশ মিলিটারী ও নিরাপত্তাবাহিনী তাদের দড়িটিও ধরতে পারছে না। কেউ বিদেশী নয়—সবাই ভারতের মুসলমান। তবু তাদের ধরতে পারা যাচ্ছে না। পারবে কি করে? ভারতের মুসলমানরাই যে তাদের থাকা-খাওয়া-শোওয়ার নিরাপদ ব্যবস্থা করছে! সন্ত্রাসীদের আশ্রয়দাতা এইসব জল্লাদদের শাস্তিদানের বিধান কংগ্রেসী শাসন ব্যবস্থায় নেই। থাকবে কি করে? সন্ত্রাসীরা যে কংগ্রেসের পোষ্যপুত্রতুল্য। আত্মসমর্পণকারী পাকিস্তানী সৈন্যদের শিবিরে যে কংগ্রেস সরকার 'কনডোম' সরবরাহ করেছে, তারা করবে সন্ত্রাসীদের বিচার?

জিন্না ও মুসলিম লীগের কাছে গান্ধী-মার্কা কংগ্রেস দল কৃতজ্ঞ। একথা মানুষকে বুঝতে হবে যে ১৯২০ সালে জাতীয় কংগ্রেসের মৃত্যু হয়েছে, জন্ম হয়েছে গান্ধী কংগ্রেসের। কংগ্রেসীরা যে টুপি পরে, তা গান্ধীটুপি বলে কথিত। অথচ গান্ধী নিজে এই টুপি পরেননি। তিনি মুসলমান খিলাফতীদের সঙ্গে যে গাঁটছড়া বেঁধে সাম্প্রদায়িক রাজনীতিতে ইন্ধন জুগিয়েছেন, মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাকে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন। হিন্দুদের মাথায় এই মুসলমানী টুপি পরিয়ে তিনি হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের ভেলকি দেখাতে গেলেন। কিন্তু মুসলমানদের ভোলাতে পারলেন না। হিন্দুরা মুসলমানদের আলিঙ্গন করতে গেল; আর মুসলমানরা আলিঙ্গনাবদ্ধ অবস্থায় ছোরা মেরে হিন্দুদের ভুঁড়ি ফাঁসাল। গান্ধীর ঐক্য প্রচেষ্টার ২৫ বছরের মাথায় মালাবারের মোপলাদের হাতে হিন্দু-নির্যাতনের রৌপ্যজয়ন্তী অনুষ্ঠিত হলো নোয়াখালীর বুকে।

দেশভাগ হলো। ভারতমাতার দেহ খণ্ডিত হলো। তার বাহু (পাঞ্জাব) এবং মস্তিষ্ক (বঙ্গদেশ) দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হলো। শক্তিহীন ও মস্তিষ্কহীন ভারতের শাসনভার পেল গান্ধী-নেহরু গোষ্ঠী। এদের কাছে পড়ে পাওয়া চৌদ্দ আনা। ভাগ্যিস জিন্না-মুসলিম লীগ দেশভাগের দাবী তুলে দাঙ্গা-হাঙ্গামা বাধিয়েছে, তাই তো গান্ধীভক্ত কংগ্রেসী তথা নেহরু গোষ্ঠীর হাতে খণ্ডিত ভারতের শাসনভার পড়েছে। তাই মুসলমানদের প্রতি নেহরু-গান্ধী গোষ্ঠীর কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। মুসলমানদের রাষ্ট্রবিরোধী কাজের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নিতে এদের বিবেকে বাধে, অকৃতজ্ঞতার অপরাধবোধে এরা সশঙ্কিত।

দেশভাগের প্রাক্কালে— যখন প্রত্যেকটি হিন্দু লোক বিনিময়ের পক্ষপাতী ছিল, বিধর্মী বিচ্ছিন্নতাবাদী ও হিন্দুদ্বেষী মুসলমানদের দেশ থেকে বিতাড়িত করে ভারতমাতার পবিত্র দেহকে গো-রক্তের অপবিত্রতা থেকে শুদ্ধ করে তোলার সুবর্ণ সুযোগ এসেছিল, তখন গান্ধী-নেহরু গোষ্ঠীই তার পথে বাধা সৃষ্টি করল। ১০ কোটি মুসলমান পাকিস্তান চেয়েছিল—সে হিসাবে তারা ভারতের ৩৪ শতাংশ ভাগ করে নিল; কিন্তু কার্যত সাড়ে পাঁচ কোটি মুসলমান পাকিস্তানে গেল আর নিয়ে গেল ৩৪ শতাংশ মাটি এবং সাড়ে তিন কোটি মুসলমান এদেশে থেকে গেল। অর্থাৎ এই সাড়ে তিন কোটি মুসলমানের মাটি চলে গেল পাকিস্তানে— কিন্তু তারা রয়ে গেল হিন্দুস্থানে।

নেহরু-গান্ধী গোষ্ঠী এই সাড়ে তিন কোটি মুসলমানকে ভোট-ব্যাঙ্ক হিসাবেই এদেশে রেখে দিয়েছিল এবং মুসলমানদের রক্ষাকর্তা সেজে একের পর এক নির্বাচনী ফায়দা তুলেছিল। কিন্তু প্রজনন প্রক্রিয়ায় মুরগী ও শূয়রনীতি অনুসরণ করে মুসলমানরা ৬০ বছরে সেই সাড়ে তিন কোটিকে পাঁচ গুণ বাড়িয়ে এখন কংগ্রেসকে বুড়ো আঙুল দেখাচ্ছে। কংগ্রেস তাদের রক্ষা করবে কি, মুসলমানরাই কংগ্রেসের রক্ষাকর্তার ভূমিকা নিয়েছে। অস্তিত্ব রক্ষার্থে কংগ্রেস এখন মুসলমানদেরই পায়ে পড়েছে। কেরল অসম পশ্চিমবঙ্গ— এই তিন রাজ্যে মুসলমানরা ক্ষমতা দখলের তোড়জোড়ায় বিহার উত্তরপ্রদেশে তারা যেদিকে চলবে সেদিকেই মন্ত্রিসভা চলবে— নইলে গদি টলবে।

দিকে দিকে যখন কংগ্রেসের পায়ের তলার মাটিতে ধস নামছে, দেশের স্বার্থ হিন্দুর স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে ততই তাদের মুসলমানদের পায়ে গড়াগড়ির ধুম পড়েছে। হিন্দু-সন্ত্রাসের ধুয়া তুলে মুসলমানদের মনে ভয় ধরিয়ে হারানো জমি পুনরুদ্ধারে নেমেছে।

কিন্তু দিগ্বিজয় সিং ও রাহুল গান্ধীর মতো 'মিঞাভাইদের' একথা জানা উচিত যে, মুসলমানরা আর ভয় পাওয়ার জায়গায় নেই। তারা হিন্দুভারতকে ভয় দেখাবার জায়গায় এসেছে। তাদের মনে হিন্দু সন্ত্রাসের নামে ভীতি সঞ্চারের বৃথা চেষ্টা করলে কংগ্রেস একদিকে হারাবে হিন্দু ভোট, অপরদিকে ফিরে পাবে না মুসলমান ভোট। ফলে একদা সাম্প্রদায়িকতাবাদী ও বর্তমানে বিচ্ছিন্নতাবাদী হিন্দুরশত্রু সোনিয়া কংগ্রেসের আমও যাবে ছালাও যাবার সম্ভাবনাই প্রকট হবে। হিন্দুস্বার্থ হানি করে মুসলিম তোষণের মূল্য গান্ধীজীকেও দিতে হয়েছে, কংগ্রেসীরা সে কথা মনে রাখে যেন।

মোস্ট ওয়ান্টেড
ইন্ডিয়ান মুজাহিদিন

- **গুজরাট** মুজিব, আলমজেব আফ্রিদি
- **কর্ণাটক** আহমেদ ইয়াসিন, মুদাসসির ইয়াসিন এবং রিয়াজ ভটকল ও ইকবাল ভটকল
- **মহারাষ্ট্র** আবদুল সুভান উসমান কুরেশি, আবু ফয়জল, মহসিন চৌধুরি
- **উত্তরপ্রদেশ** অরিজ খান, মির্জা সাহাব বেগ, মহম্মদ সাজিদ, মহম্মদ খালিদ, শাহনওয়াজ আলম, আসাদুল্লাহ আখতার, আবু রশিদ, শারফুদ্দিন
- **ঝাড়খণ্ড** দানিস, মঞ্জর ইমানুদ্দিন খান

জে এ আই এম

- **কর্ণাটক** মহম্মদ হুসেন ফারহান, মৌলানা সুলতান শাহ, আজম, জসিম, সমির সালিম খান, ওয়াসিম
- **কেরল** কে পি সাবির, মহম্মদ আজহার, পি পি ইউসুফ, শফিক, রইসল, মহম্মদ সমির ফাগনেস্ত

ছাইয়ের গর্ত থেকে উঠে এসো...

বিশাখা বিশ্বাস

লক্ষ লক্ষ প্রতিবাদী বুভুক্ষু মানুষকে বন্দুকের নলে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছিলেন ইন্দোনেশিয়ার সেনাশাসক সুহার্তো এবং সেই হত্যালীলার পুরো সময়টা ধরেই তাকে সমর্থন দিয়ে গেছিলেন শিল্পপতি সালিম গোষ্ঠী। চৌত্রিশটি বছর ধরে এ রাজ্যের হাজার হাজার মানবদেহকে হয় হত্যা নয়তো গুম করে ফেলেছে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের পুলিশ ও হার্মাদবাহিনী এবং সেই মুখ্যমন্ত্রীকেই ঢালাও সমর্থন করে এখানে শিল্পপতি রতন টাটা বলেছিলেন 'মাথায় বন্দুক ঠেকালেও সিঙ্গুর ছেড়ে যাবো না।'—কেন?

সুহার্তোকে সালিমের সমর্থনের গুপ্ত রহস্যটি হলো, সুহার্তো সালিমকে দিয়েছিলেন বিদেশী গম কমদামে কিনে এনে মজুত করে তা বিক্রীর গোপন চুক্তির একচেটে বরাত এবং বুদ্ধ-নিরূপমের টাটার প্রেমের গোপন মর্মটি ছিল টাটাকে তারা দিয়েছিলেন প্রায় বিনাপয়সায় হাজার একর কৃষিজমি, জমির সাথে বস্তুচর্চিত সেই 'ট্রেড সিক্রেট'-এর গুপ্ত চুক্তিপত্র এবং 'উপরি পাওনা' হিসেবে রাজারহাটের লক্ষ লক্ষ টাকার অবৈধ টেলিকম ফেসিলিটিজ।

দীর্ঘদিনের কায়েমী কু-শাসনের একেবারে শেষ লগ্নে পৌঁছে, ভাসমান কচুরিপানার মতো বুদ্ধের সরকার যখন সাগরের দিকে দ্রুত ছুটে চলেছে, ঠিক তখুনি 'রামকে' ধরেছেন বুদ্ধ। তবে এ রাম সেই 'শ্রীরাম' নন, বিলিতি মদের ১৯৪৬ টি দোকানের বদলে এই 'রাম' এখন থেকে মিলবে আড়াই হাজার নামীদামী ভাটিখানার বাইরেও রাজ্যের পানের দোকান এবং চায়ের গুমটিগুলিতেও। লক্ষ্য দুই— দেউলে সরকারের রাজস্ব বাড়াও এবং জীবন-জীবিকা-লড়াই আন্দোলনের সমস্যা থেকে মাতাল মানুষের নজর ঘোরাও। কমরেড, ঢুকু ঢুকু পিও আউর চৌত্রিশ 'ভুলাও' জিও।

নন্দন-সংস্কৃতির সোল-এজেন্সী কাঁধে নিয়ে যিনি রাজ্যে বসে বলছেন আমাদের রাজ্যের আদিবাসীরা অন্যরাজ্যের তুলনায় অনেক ভালো আছেন। আবার দিল্লী গিয়ে তিনিই বলছেন উন্নয়ন হয়নি বলেই আদিবাসী অঞ্চলে মাওবাদের এতো বাড়াবাড়ি। অথচ লক্ষ লক্ষ টাকার আলু কোথায় পাচার হয়ে চলেছে, কোথায় পুলিশ আর হার্মাদের যৌথ হামলায় গ্রামের পর গ্রাম দখল হয়ে চলেছে, কোথায় কারা টাকার বিনিময়ে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীর কাজ দিচ্ছে, হার্মাদ-বাহিনী গুলিয়া জারী করে কোথা থেকে তার সভায় মানুষ জড়ো করছে— তিনি তার কিছুই জানেন না। এখন কাবার্ড থেকে কঙ্কাল বেরিয়ে আসছে। ই. এম. বাইপাশে যে জমির স্বত্বই আসেনি সরকারে, সেই একাত্তর একর জমি চতুর্থ শ্রেণীর চিটিংবাজদের মতো প্রায় দুইশ' কোটি টাকায় পুঁজিপতির পায়ে উপঢৌকন দেবার পর এখন বলা হচ্ছে ফাইলই হারিয়ে গেছে! ঝুলির বেড়াল বেরিয়ে আসছে যখন তখুনি তদন্তে জানা গেছে যে, সদ্যধৃত মাওবাদী প্রথম স্তরের নেতা সুদীপ গুরুকে কাঞ্চনেরা সিপিএমের সুশান্ত ঘোষের সাথে কেশপুর-গড়বেতায় তৃণমূলকে নিঃশেষ করেছিল। রাজারহাটের জমিলুঠেরারা নাকি বুঝতেই পারছেন না ছিয়ানব্বই সালের জমিদাতারা আজ চৌদ্দ বছর পরে কেন আন্দোলন করছেন। সহজে বোঝার বিষয়ও নয়— ফ্যাসীবাদী কায়দায় স্ট্যালিনীয় দমনপীড়নের ধারায় সন্ত্রাস-ভীতি-ভক্তিতে গণতান্ত্রিক চেতনা হারানো মানুষেরা বিরোধী-বিহীন এবং কেন্দ্রিয় সরকারের 'দুঃসময়ের বন্ধু' রাজ্যে কেমন করে নীরবে সব অত্যাচারই মুখ বুজে মেনে নিতে বাধ্য হয় তা সহজবোধ্য নয়। মূলকের সেই বীভৎস হত্যাকাণ্ড, সুচপুরের সেই কৃষক-নিধন পর্বগুলি পার্টির স্থানীয় কম্যান্ডার-ইন-চীফগণের প্রবল দাপটে কতবছর পরে মানুষের নজরে এলো? 'নিম্ন ও মধ্য আয়ের মানুষের জন্যে বাসস্থান বানাবার প্রলোভনে গরীব মানুষের জমি লুঠেরা রাজাদের জন্যে রাজারহাট বানিয়ে দুর্নীতি, দম্ভ এবং ক্ষমতার পর্বতশিখরে বসে নৃত্যরতা শিল্পীর মতো আলোচনায় ডাকলেই ধনেখালির আটপৌরে শাড়ীপরা কোথাকার এক হরিদাস পালকে সেখানে যেতেই বা হবে কেন? রাজনীতি করলেই কী রাজার ঠেঙাড়েদের ডাকে সাড়া দেওয়া যায়? সিদ্ধার্থ রায়ের সেই সাজানো 'বিধানসভায়' সিপিএমের সেই বয়কটকালে সিদ্ধার্থের শত অনুরোধেও তার অনুপস্থিতির সেই গণতান্ত্রিক ও সাংবিধানিক ইতিহাস আজ কী ভুলে গেল সিপিএম?— শেম, শেম।

বামফ্রন্ট, বামপন্থা এবং এমনকী লাল-ঝাণ্ডার সাথেই বিশ্বাসঘাতকতা করে নন্দনের বাজারী আইকন বুদ্ধ, নাটা-ক্যাডিকেভারের গভীরতর ডুবুরি বিমান বোস এবং জমি লুণ্ঠনের বৃকোদর গৌতম দেবেরা আলিপুর ট্রেজারি কেলেঙ্কারির কোটি কোটি টাকা চুরির পর আবার এখন নানান জেলায় ট্রেজারি-কোষাগার থেকে একশ আশি কোটি টাকা লোপাট করে মদ, পর্নোছবি, হার্মাদ এবং লালঝাণ্ডার মোটা ডান্ডাকেই ভেবেছে সিপিআই(এম)-এর সর্বশেষের শক্তি। 'উনিশ' সাঁইত্রিশ-আটত্রিশ সালে স্ট্যালিনের ঘাতকবাহিনী যে সাতলক্ষ ইউক্রেনীয় মানুষকে ভূ-খণ্ডের নীচে কবরস্থ করেছিল তাদের সবাই ছিল কৃষক এবং মজুর এবং স্ট্যালিনের সেই বধ্যভূমিতে যাবার আগে তাদেরই একজনমাত্র প্রতিবাদী তার স্ত্রীকে লেখার সুযোগ পেয়েছিল 'হয়তো মাটির নীচেই আমার সাথে আবার দেখা হবে তোমার।'

এবং এই রাজ্যে ও এখানে সাতাত্তর থেকে দশসাল তক ছোট্ট এক অন্ধরাজ্যের জানা-অজানা হাজারো কবরে শায়িত প্রায় ছাপান্ন হাজার নিহত মানুষের বিদ্রোহী আত্মাগুলো আজ গণতন্ত্রের সর্বাধিক এই দুঃসময়-এ মাটির ওপরে উঠে এসে বলছে 'কৃষক কিশোরী ছাই-য়ের গর্ত থেকে উঠে এসো, শঠ ও জোচ্চোরদের মুখে থুতু ছেটাবার সময় হয়ে এসেছে।'

Swastika
3 January - 2011, Rs. 4.00 only
RNI No.5257/57
Registration No. Kol. RMS / 048/2010 -2012
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT
License No. MM&P.O. / SSRM-Kol. RMS/ RNP-048/LPWP-028/2010 -12

চলুন মা নর্মদা সামাজিক কুম্ভে

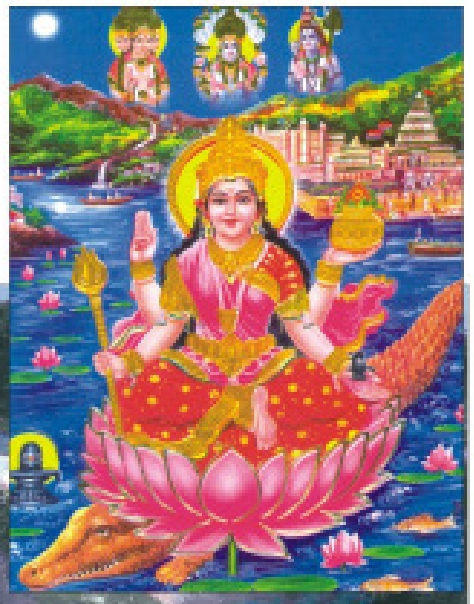

ভৃগু নর্মদার রূপ

নবকুমার ভট্টাচার্য

ঋষি সেবিত দেশ আমাদের এই ভারতবর্ষ। এখানকার ব্রহ্মর্ষি মহর্ষিদের ধ্যান দৃষ্টিতেই পৃথিবীতে সর্বপ্রথম ঘোষিত হয়েছিল এক পরম তত্ত্ব— সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম। গঙ্গা, গোবিন্দ, গায়ত্রী, গীতা— আমাদের শেষ সম্বল পারের কড়ি হলেও নর্মদা নদীকূলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। কারণ রুদ্রের তেজ থেকে তিনি সমুৎপন্না। স্থাবর জঙ্গম সমস্ত কিছুকেই তিনি ত্রাণ করেন। শুদ্ধচিত্তে তাঁর তট পরিক্রমা করলে সর্বসিদ্ধি করায়ত্ত হয়। মহাভারতের বনপর্বে ঋষি পুলস্ত্য যুধিষ্ঠিরকে বলেছেন— দেখ যুধিষ্ঠির, তুমি অন্যান্য তীর্থে তো যাবেই। বিশেষ করে ত্রিলোক প্রসিদ্ধ নর্মদাকে অতি অবশ্যই দর্শন করে আসবে। নর্মদাতে পিতৃপুরুষ এবং দেবতাদের পুজো তর্পণ করলে অগ্নিষ্টোম যজ্ঞানুষ্ঠানের ফললাভ হয়। আজকের বিশ্বায়ন ইন্টারনেটের যুগেও বিশ্বপ্রকৃতির উদার ঐশ্বর্য ও সৌন্দর্যের অন্তরালে যে বহু বিচিত্র রহস্য লুকিয়ে আছে তাকে জানার জন্য নর্মদার তীরে তীরে আপনাকে অন্তত একবার যেতেই হবে। নর্মদার নিত্য জলপান, নিত্যস্নান এবং তাঁর তটে তটে যেসব শিবলিঙ্গ— তাঁর অর্চনা করতে করতেই জীবের দুর্গতি নাশ হয়। নর্মদার আশীর্বাদ ধন্য মহামুনি মার্কণ্ডেয়, মহর্ষি ভৃগু, কপিল, কর্দম প্রমুখেরা। এই সাম্প্রতিক কালেও পিতার আদেশে মাত্র চব্বিশ বছর বয়সে নর্মদা পরিক্রমা করেছিলেন মেদিনীপুর জেলার এক ব্রাহ্মণ সন্তান শৈলেন্দ্র নারায়ণ ঘোষাল। নর্মদা পরিক্রমা করে ফিরে এসে অভিজ্ঞতালব্ধ কাহিনী শুনিয়েছেন আমাদের। তাঁর 'তপোভূমি নর্মদা' গ্রন্থের দশটি খণ্ড আজও নর্মদা সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক গ্রন্থ। শৈলেন্দ্র নারায়ণ নর্মদার তীরে ছুটে গেছেন বারবার। নর্মদার উৎসস্থল মধ্যপ্রদেশের অমরকণ্টক। সেখান থেকে নর্মদা সমুদ্রে গিয়ে মিলেছে গুজরাটের ভৃগুতে।

নর্মদার উৎপত্তিস্থল অমরকণ্টকের চূড়ায় একবার ধ্যানমগ্ন ছিলেন ধূর্জটি। সহসা মহাদেবের নীলকণ্ঠ হতে আবির্ভূতা হলেন নর্মদা। নির্গতা হয়েই তিনি মহাদেবের দক্ষিণ চরণের উপরে দাঁড়িয়ে শিব তপস্যায় রত হলেন। এভাবে কেটে গেল বহুকাল। তারপর একদিন স্বয়ম্ভু উত্থিত হলেন তাঁর সমাধি হতে। দৃষ্টি উন্মীলন করেই তিনি দেখতে পেলেন সেই অপরূপা কন্যাকে। মাথায় সুশুভ্র জটাভার। সারা অঙ্গকে ঘিরে বিকীর্ণ হচ্ছে দীপ্তির ছটা। দিব্য লাবণ্য ও তপশ্চর্যাজনিত জ্যোতির বিচ্ছুরণে সমগ্র পর্বতশৃঙ্গ অপূর্ব প্রভায় আলোকিত। বাম হস্তের কব্জিতে একটি কমণ্ডলু গলানো রয়েছে, দক্ষিণ হস্তের একটি অঙ্গুলিতে একটি অক্ষমালা দুলছে। কুমারীর ধ্যানভঙ্গ করে শিবসুন্দর জিজ্ঞাসা করলেন— কে তুমি মা! তোমার কঠোর তপস্যায় আমি প্রীত। সেই মহাকন্যা উত্তর দিলেন— সমুদ্র মন্থনের গরল পান করে হে মন্ত্রমূর্তি মহেশ্বর, আপনি নীলকণ্ঠ হয়েছেন। আমার উদ্ভব সেই নীলকণ্ঠ হতে। কেবল প্রার্থনা করি আমি যেন ঠিক এই রকম চিরকাল আপনার সঙ্গে নিত্যযুক্তা হয়ে থাকতে পারি। তথাস্তু বলে মুহূর্তে অন্তর্হিত হলেন মহেশ্বর। সেই অমরকণ্টকে পুনরায় তপস্যায় বসলেন মহাকন্যা। দেবতাদের টনক নড়ল। তপস্যার পরীক্ষা আছে, মহাসিদ্ধি লাভের পূর্বক্ষণেও আছে অগ্নিপরীক্ষা। কিন্তু মর্ত্য-মানুষের মতো দেবতারা কেন কুমারীর অপরূপ সৌন্দর্যে চঞ্চল হবেন? পতঙ্গের মতো তাঁরা ছুটে এলেন তাঁর কাছে। অনেক আবেদন নিবেদন করলেন। প্রত্যাখ্যাত হয়ে শেষে শক্তির দ্বারা জয় করতে চাইলেন কুমারীকে। দেবতাদের দুরভিসন্ধি বুঝতে পেরে চকিতে নদীরূপ ধারণ করে গহন কান্তারের মধ্য দিয়ে পর্বতগাত্রের ফাঁকে ফাঁকে ছুটে চললেন কুমারী। দর্পচূর্ণ হলো দেবতাদের। অলক্ষ্যে থেকে সব কিছুই লক্ষ্য করছিলেন মহাদেব। কন্যার কাছে আবির্ভূত হয়ে সহাস্যে বললেন— আজ থেকে তুমি আমার জলময় রূপ হলে। হে শিবাঙ্গজে, তুমি জলময়ী শিবা, তোমার পুত্র হয়ে তোমার কোলে নিত্যকাল বিরাজ করব। কামনা বাসনা পরিত্যাগ করে নর্মদাতটে যে তপস্যা করে নর্মদার প্রসাদে সে মোক্ষ পর্যন্ত লাভ করবে।

সপ্তটপ্রিয় মহাতীর্থ অমরকণ্টক। অপর নাম মেকল বা ঋক্ষ। বিন্ধ্যপর্বত ও সাতপুরা পর্বতমালার মধ্য দিয়ে নর্মদা

শৈলেন্দ্র নারায়ণ ঘোষাল

পশ্চিমগামিনী হয়ে আরব অর্থাৎ সিন্ধু সাগরে গুজরাট রাজ্যের অন্তর্গত ভারোচ গিয়ে মিলিত হয়েছে।

নর্মদার উত্তরে বিন্ধ্যপর্বত ও দক্ষিণে সাতপুরা পর্বতমালা, আশি তের মাইল দীর্ঘ নর্মদার তিন চতুর্থাংশ মধ্যপ্রদেশে। মধ্য প্রদেশের শাডোল, মাণ্ডালা, নরসিংহপুর, হোসেঙ্গাবাদ, খাণ্ডোয়া, খরগোন জেলা অতিক্রম করে নর্মদা গুজরাটে প্রবেশ করেছে। সারা ভারতবর্ষই শিবময়। তার মধ্যে নর্মদা হলেন জীবন্ত শঙ্কর ভাষ্য।

মধ্যপ্রদেশের মাণ্ডালা হচ্ছে নর্মদাতীর্থের একটি শহর। জবলপুর থেকে প্রায় ১০০ কিমি দূরে এই শহরটি অবস্থিত। কথিত রয়েছে এই স্থানে পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধ ও পিণ্ডদান করলে মোক্ষপ্রাপ্তি হয়। এই স্থানেই সহস্রার্জুন রাক্ষসরাজ রাবণকে যুদ্ধে হারিয়ে বন্দী করে তাঁর দম্ভ নাশ করেছিলেন। এই স্থানেই আদিশঙ্করাচার্যের সঙ্গে মণ্ডন মিশ্রের শাস্ত্র বিচার সভা বসেছিল। রাণী দুর্গাবতীর স্বপ্নের নগরী এই মাণ্ডলা। প্রাকৃতিক শোভায় পরিপূর্ণ নর্মদা নদীতীরে আগামী ১০.১১.১২ ফেব্রুয়ারি ২০১১ হতে চলেছে মা নর্মদা সামাজিক কুম্ভ। এই কুম্ভমেলা কেবল আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে নয়, দেশের সামাজিক একতা ও বন্ধনকে সুদৃঢ় করার এক উজ্জ্বল প্রয়াস। তাই এই কুম্ভমেলায় আপনার উপস্থিতি একান্ত প্রয়োজন।

প্রকাশিত হবে ২৪ জানুয়ারি, '১১ স্বস্তিকা প্রকাশিত হবে ২৪ জানুয়ারি, '১১

কাশ্মীরে বিচ্ছিন্নতাবাদ

আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রে বিচ্ছিন্নতাবাদ পুনরায় মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে ভূস্বর্গ কাশ্মীরে। বিগত দু'দশক ধরে তিনটে যুদ্ধ, ছায়াযুদ্ধ, রাজনৈতিক চক্রান্তের পর পাক সেনাবাহিনী ও বিচ্ছিন্নতাবাদীদের পরবর্তী লক্ষ্য অরুন্ধতী রায়, এস এ আর গিলানি, মীরওয়াজ ফারুকের মতো এজেন্টদের দিয়ে ভারতের মাটিকে ব্যবহার করে কাশ্মীরকে ছিনিয়ে নেওয়া। মুসলিম ভোটব্যাঙ্কের স্বার্থান্বেষী কংগ্রেস ও কমিউনিস্ট মদতপুষ্ট দল ও কেন্দ্রীয় সরকার তাই সব কিছু বুঝেও চোখে ঠুলি এঁটে রয়েছে। এদের মুখোশ উন্মোচন করতে প্রজাতন্ত্র দিবসের প্রাক্কালে আমাদের নিবেদন – 'কাশ্মীরে বিচ্ছিন্নতাবাদ'।

লিখেছেন ঃ মেজর জেনারেল কে কে গাঙ্গুলী, তথাগত রায়, দীনেশ চন্দ্র সিংহ প্রমুখ।

।। রঙিন প্রচ্ছদ।। গ্রন্থকারে প্রকাশিত হচ্ছে।। দাম ঃ ছয় টাকা।।

আগামী ১৫ জানুয়ারির মধ্যে কপি বুক করুন।

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রমেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩ কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।
সম্পাদক ঃ বিজয় আঢ্য, সহ সম্পাদক ঃ বাসুদেব পাল ও নবকুমার ভট্টাচার্য। দূরভাষ ঃ সম্পাদকীয় - ৯৮৭৪০৮০৩৪৩, অফিস - ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১, বিজ্ঞাপন - ৯৮৭৪০৮০৩৪২, ২২৪১-০৬০৩, টেলিফ্যাক্স ঃ ২২৪১-৫৯১৫,
e-mail : swastika5915@gmail.com / vijoy.adya@gmail.com, website : www.eswastika.com